২ মে ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

■ রূপক সাহার খেলার গল্প

■ প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস

যান্ত্রিক খেলনা

রোবট, ট্যাঙ্ক আর বোমারু বিমান
নিয়ে আশ্চর্য খেলা

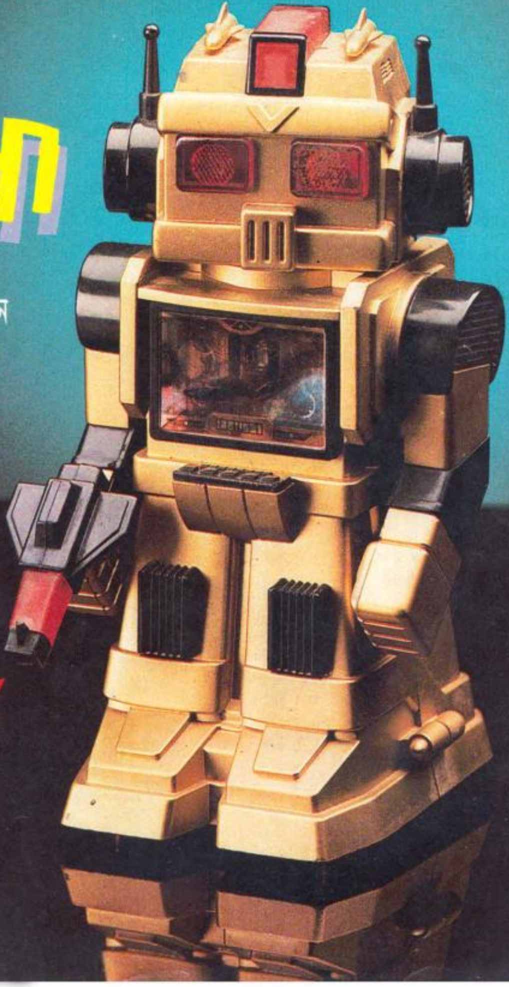

মারাদোনার আর্জেন্টিনা

■ অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার

■ ইলেকট্রনিক্স গেম

■ কেরিয়ার গাইড

■ কম্পিউটার প্রোগ্রাম

মামণি বলো একটা ২০০ গ্রাম সিবাকার প্যাকেট নিয়ে আসতে । ভেতরে দারুণ সুন্দর একটা ছোট্ট জানোয়ার পাবে ।

Trikaya Grey HCG.6.90 BEN

১৮ বৈশাখ ১৩৯৭ □ ২ মে ১৯৯০ □ ১৬ বর্ষ ২ সংখ্যা

আনন্দমেলা

■ সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ) ■

টিকারা দামামা বাজে প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ৫৪

■ গল্প ■

নদুস্কোপ রূপক সাহা ২৫

পিতলের কবন্ধমূর্তি কানাই কুণ্ডু ৬৬

■ প্রচ্ছদকাহিনী ■

যান্ত্রিক খেলনা গৌতম চক্রবর্তী, স্বপ্নাতীত সরকার ১২

■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■

উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৭৫

সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৩৭

■ এই দেশ এই বিশ্ব ■

অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকার ৬

■ কমিক্‌স ■

টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৫১, গাবলু ৫৩, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩

■ টাকাকড়ি ■

ভারতে টাকা তৈরির···ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭৯

■ কবিতা ■

বন্ধার পছন্দ প্রভাকর মাঝি ৩৮

■ প্রযুক্তিবিজ্ঞান ■

কম্পিউটার প্রোগ্রাম অসীমরতন ঘোষ ৩২

■ কেরিয়ার গাইড ■

ফিনানশিয়াল অ্যানালিস্ট অমর দাশ ৬৪

■ খেলাধুলো ■

মনোজকে বদলে দিয়েছেন···মানস চক্রবর্তী ৪০

রঙিন পোস্টার : চিমা ওকেরি ৪২

মারাদোনার আর্জেন্টিনা কি···অনুপ সেন ৪৪

বিশ্বকাপে চমক দেখাতে পারে আমেরিকা সন্দীপ বসু ৪৬

খেলার খবর ৪৭, মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৪৮

■ নিয়মিত বিভাগ ■

চিঠিচাপাটি ৫, ক্যাম্পাস ৯, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, কুইজ ২২, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫০, আকাশে ওড়ার কথা ৫৮, ইলেকট্রনিক্স গেম ৬০, শব্দসন্ধান ৬৩, আঁকিবুকি ৭০, হাসিখুশি ৭০, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

■ প্রচ্ছদ ■

খেলনা রোবট। ফোটো : বিবেক দাস

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল

শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য

সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার।

দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

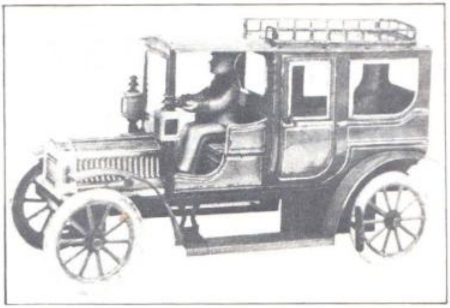

১২ কাঠের পায়রা। ছেড়ে দিলে তারা কিছুটা উড়ে গিয়ে আবার নীচে নেমে আসে। পায়রাগুলি তৈরি করেছিলেন প্রাচীন গ্রিসের যন্ত্রবিদ এরিখটাস। প্লেটো সেগুলি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যান্ত্রিক খেলনার সেটাই হয়তো আদি যুগ। আর এখন বিজ্ঞান যে কীভাবে খেলাধুলোর জগতে ঢুকে পড়েছে, এবং শুধু ঢুকে পড়েনি, অনেকটা জায়গাও দখল করে নিয়েছে নিজের অধিকারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। যান্ত্রিক খেলনার মধ্যে আছে রোবট, জঙ্গি বিমান, ট্যাঙ্ক। তা ছাড়াও হরেকরকম পুতুল। কেউ আবার 'মামি' 'ড্যাডি' বলে। এবারের প্রচ্ছদকাহিনীর বিষয় যান্ত্রিক খেলনার রোমাঞ্চকর জগৎ।

৪০ এক সময় মনোজ প্রভাকরকে ভারতীয় টেস্ট দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। সেই মনোজ প্রভাকরই এখন ভারতীয় দলে ফিরে এসে রীতিমত শোরগোল তুলেছেন। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেট দলের বোলিংয়ের তিনিই এখন প্রধান ভরসা। কপিলকেও তিনি ম্লান করে দিয়েছেন। মনোজ প্রভাকরের একান্ত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রকাশিত হল একটি নিবন্ধ। মনোজ বলেছেন, মুদাস্‌সার নজর তাঁকে সাহায্য করেছেন। পুরনো বলে বিধ্বংসী বোলিং করার কৌশল তিনি তাঁর কাছেই শিখে নিয়েছেন।

৬ পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে বছরের বিশেষ একটা দিনে জমে ওঠে শিকার উৎসব। আদিবাসীরা এতে অংশ নেন। এই উৎসব তাঁদের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীরাই নন, বিহার, অসম ও ওড়িশার আদিবাসীরাও এই শিকারে যোগ দেন।

■ আগামী সংখ্যায় ■

বিকাশ চক্রবর্তীর
প্রচ্ছদকাহিনী
আফ্রিকার জঙ্গলে

প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের
সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)
টিকারা দামামা বাজে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প
অরণ্যের অপমান

অসীমরতন ঘোষের
প্রযুক্তিবিজ্ঞান
লোগোর সঙ্গে ছবি আঁকো

আপনার ত্বককে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বাছাই করা স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতীর

অভিনব, নরম স্ট্রাইপড ১০০% সুতীর কাপড়

সূক্ষ্মতম সুতীতে বোনা—তাই যেমন নরম—পরেও তেমন আরাম। আপনার ত্বককে দেবে স্বাচ্ছন্দ্য—দেখতেও দারুণ।

পা ও কোমর ঘিরে ইলাসটিকের স্বাচ্ছন্দ্য

এই কাজকরা, নরম ইলাসটিক দেখতেও ভালো— পরতেও ভালো। পরে দেখুন, মাপও একেবারে ঠিকঠাক।

মেয়েদের গঠন অনুযায়ী সুন্দর, আধুনিক কাট

এই প্যান্টি আপনার শরীরের আকার নেবে। বেশী আঁটো বা বেশী ঢিলে হবে না। চলতে ফিরতে কত আরাম।

বেল মানেই ভালো জিনিষ, ঠিক দাম

বাছাই করা সেরা উপাদান, বিদেশী মেশিনে সেলাই করা—বেল্ পালোমা প্যান্টি যেমন আরামদায়ক তেমন টেকসই।

পালোমা স্ট্রাইপ্স—১৮/-
পালোমা রিবড—১৬/-
পালোমা ডোরি—১২·৫০

যে সব কমিশন এজেন্ট/রিটেলাররা আমাদের সেরা মানের জনপ্রিয় অন্তর্বাস বিক্রী করতে চান, তাঁদের আমরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। এ ছাড়াও কলকাতার বড়বাজারে পাইকারী হারে পাওয়া যায়।

Belle Wears Private Ltd
54B Suburban School Road
Calcutta 700 025
Phone : 48-3708

৪,০০,০০০ মহিলার প্রিয় বেল্—আপন করে নিন belle

'৮৮-র পূজা থেকে বেল্-এর 'ডোর-টু-ডোর' বিক্রী বন্ধ হয়ে গেছে।

HTA 3578 R2

চিঠিচাপাটি

কুইজ প্রসঙ্গে

২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় কুইজ বিভাগের উত্তরে একটি ভুল চোখে পড়ল। প্রশ্নটি ছিল—'আইরিশরা আয়ারল্যান্ডকে কী বলে ?' উত্তর প্রকাশিত হয়েছে—'আইয়ার'। সঠিক উত্তর হবে—'এইরে' (Eire)।
এই প্রসঙ্গে জানাই যে, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আয়ারল্যান্ড নিয়ে একটি ভ্রমণকাহিনী পড়েছিলাম। চমৎকার তথ্যমূলক এই প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'এইরে'।
ফণিভূষণ চক্রবর্তী
গ্যাংটক, সিকিম

বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা

আনন্দমেলা শুধু উন্নতমানের পত্রিকাই নয়, এটি একটি মনের মতো পত্রিকা। প্রতিটি সংখ্যায় থাকে আলাদা একটি আকর্ষণ। বিজ্ঞানভিত্তিক লেখাগুলিও খুবই উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞান : গবেষণা, বিশ্ববিচিত্রা, প্রযুক্তিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগগুলিও সুন্দর। 'অষ্টম গ্রহ প্লুটো' লেখাটি খুব ভাল লেগেছে। তেমনই ভাল লেগেছে 'সাগরপারের পাখি'।
রবীন্দ্র আগরওয়াল
বাঁকুড়া জিলা স্কুল, বাঁকুড়া

রোমাঞ্চকর কল্পবিজ্ঞান

'কল্পবিজ্ঞানের রোমাঞ্চ' প্রচ্ছদকাহিনী পড়লাম ২১ মার্চ সংখ্যায়। গৌতম চক্রবর্তীর লেখা এই নিবন্ধটি পড়ে ভীষণ ভাল লাগল। লেখক তাঁর লেখায় 'ফ্যানটাস্টিক ভয়েজ' ছবিটির কথা বলেছেন। ওই প্রসঙ্গে তিনি স্পিলবার্গ-এর নতুন তৈরি অস্কার পুরস্কার পাওয়া ছবি 'ইনার স্পেস'-এর কথা বললে পারতেন। কারণ, এই দুটি ছবিরই বিষয় ক্যাপসুলের সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরে ভ্রমণ। নিবন্ধটিতে লেখক যেসব কল্পবিজ্ঞান-নির্ভর

চলচ্চিত্রের কথা বলেছেন, তার অধিকাংশই মহাকাশ এবং অন্য গ্রহের প্রাণীদের নিয়ে। কিন্তু কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যে শুধু মহাকাশই নয় বিজ্ঞানের অন্য বিষয়েরও সংযোজন ঘটেছে। যেমন—হাইবারনেশন, জিন ক্লোনিং ও মিউটেশনস, সুপার কন্ডাক্টিভিটি। এই বিষয়গুলি নিয়ে অনেক নামকরা ছবিও তৈরি হয়েছে। যেমন—উডি অ্যালেন-এর 'মাসলস', 'কোমা' বা 'দ্য মিউটেশনস'। এ ছাড়া এখনকার চলচ্চিত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল 'থ্রি ডাইমেনশনাল ফিল্ম'। এই নিয়েও লেখক যদি কিছু আলোচনা করতেন, ভাল হত।
সৌভিক রায়   ফিডার রোড, বেলঘরিয়া

২১ মার্চ সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী কল্পবিজ্ঞানের রোমাঞ্চ পড়ে ভাল লাগল। লেখাটিতে একটি ভুল তথ্য চোখে পড়ল। গোয়েন্দা জেমস বন্ড 'মুনরেকার' উপন্যাসে বা চলচ্চিত্রে চাঁদে পাড়ি দেয়নি। মুনরেকার ছবিতে বন্ড কেবল পৃথিবীর চারপাশে পরিভ্রমণরত মহাকাশযানে অভিযান চালিয়েছিল।
সৈকত বসাক   আহিরিটোলা স্ট্রিট   কলকাতা-৫

কল্পবিজ্ঞানের রোমাঞ্চ প্রচ্ছদকাহিনীটি দারুণ লেগেছে আমার। সেইসঙ্গে ভাল লেগেছে দুর্দান্ত সব ছবি। স্টিভেন স্পিলবার্গ-এর সম্পর্কে অনেক অজানা কথা জানতে পারলাম লেখাটি পড়ে।
সমীর সরকার   বেথুয়াডহরি, নদীয়া   উজ্জ্বল ও চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়,   বাঁকুড়া

২১ মার্চ সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী কল্পবিজ্ঞানের রোমাঞ্চ পড়ে দারুণ লাগল। কল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারলাম। অনেকদিনের কৌতূহলের নিরসন হল লেখাটি পড়ে।
মধুপা দাস   কমলা গার্লস' হাই স্কুল, কলকাতা-২৯

ইলেকট্রনিক্স গেম

২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় পার্থসারথি চক্রবর্তীর 'ইলেকট্রনিক্স গেম' আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। যদি কোনও সংখ্যায় স্বল্প খরচে সহজে তৈরি করা যায় এমন কিছু ইলেকট্রনিক্স খেলা প্রকাশ করেন, খুব আনন্দ পাব।
শুভজিৎ দাশগুপ্ত
রিপন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬

বাংলা সাহিত্যে

অণিমা মুখোপাধ্যায়ের 'ছাপা বইয়ের আগে' লেখাটি পড়ে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। কিছু উৎসাহী পণ্ডিত ব্যক্তি অনেক প্রাচীন পুঁথি খুঁজে পাওয়ায় বাংলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কথা জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি চর্যাপদের আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করেনি। ওই পুঁথিটি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কাঁকিল্যা গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘরের মাচা থেকে উদ্ধার করেন।
কৌশিক রায়
বনগ্রাম, চব্বিশ পরগনা

আগামী সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে
টিনটিন-এর নতুন গল্প
কৃষ্ণ দ্বীপের রহস্য

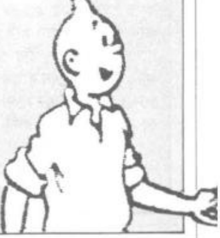

এই দেশ এই বিশ্ব

অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার

পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গলে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন হয় শিকার-উৎসব। রোমাঞ্চকর এই শিকারের কথা লিখেছেন **লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকার**

পাভুয়ার একটি গ্রামের ছেলে বীরসিং মান্ডি। পায়ের কাছে পড়ে থাকা টাঙ্গিটা নিচু হয়ে তুলে নিয়ে ধার পরীক্ষা করল। তারপর কোমরে হাত দিয়ে চারপাশটা দেখে নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বীরসিং এবারে যাবে পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার-উৎসবে।

প্রতি বছর বুদ্ধপূর্ণিমার দিন অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার-উৎসব হয়। হাওড়া-চক্রধরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠে বসলাম আমরা। আমাদের সঙ্গে হুড়মুড় করে উঠে পড়লেন প্রায় শ' তিনেক আদিবাসী। এঁরা সবাই এসেছেন পাভুয়া থেকে, যাবেন শিকার-উৎসবে। এই দলের সঙ্গে চলেছে বীর সিং মান্ডিও। এঁদের হাতে তীর-ধনুক, বল্লম, টাঙ্গি।

ট্রেন ছাড়ল ন'টা পঞ্চাশে। কামরায় তিলধারণের জায়গা নেই। থেমে-থেমে ট্রেন পুরুলিয়া গিয়ে পৌঁছল নির্দিষ্ট সময়েরও সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে। বীরসিংরা পুরুলিয়ায় নামল না। ওরা আরও কয়েকটি স্টেশন পেরিয়ে

শিকারের পর স্নানের পালা, (ইনসেট) ছোটরাও পিছিয়ে নেই

অরণ্যে, চাঁদের আলোয়

মোটা দড়ি অথবা নাইলনের জাল পাতা হয় অরণ্যে। তাড়া-খাওয়া বন্যপ্রাণীরা সেই জালে ধরা পড়ে, লিখেছেন **অশোককুমার কুণ্ডু**

বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, এমনকী বিহার-ওড়িশার বহু আদিবাসী মেতে ওঠেন শিকার-পরবে, তাঁরা এসে জড়ো হন অযোধ্যা পাহাড়ের আশপাশে।

তাই এ সময় হাওড়া থেকে পুরুলিয়াগামী ট্রেনে খুব ভিড় হয়। একবার আদ্রা চক্রধরপুর ট্রেন হাওড়া থেকেই বোঝাই হয়ে গিয়েছিল শিকারির দলে। ট্রেনের কাছে গিয়ে আমরা হতভম্ব। জানালার শিকে থরে-থরে বাঁধা রয়েছে বল্লম, টাঙ্গি, তীর-ধনুক, লাঠি ইত্যাদি। যেন যুদ্ধের গাড়ি চলেছে। আবার এর সঙ্গে কোনও-কোনও আদিবাসী যুবকের হাতে আড়বাঁশি। কেউ-কেউ বাজাতে শুরু করেছেন। আনন্দ-উৎসবে যাওয়ার মেজাজ।

আদিবাসীদের এই শিকার উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে যৌবনের উৎসাহ-উদ্দীপনা। শিকার-পরবের ভেতর দিয়ে যুবকদের সাহস ও শক্তি যাচাই করে নেওয়া হয়। কেননা ভবিষ্যতে সংসার ও সমাজের দায়িত্ব পড়বে এঁদের হাতেই। তাই পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার-উৎসবে সংখ্যায় বেশি যুবকরাই। বৃদ্ধ ও মধ্যবয়স্করাও থাকেন। কিশোরদের সংখ্যা প্রায় নগণ্য।

গন্তব্যে পৌঁছে দিনের বেলায় শিকারিরা বিশ্রাম করেন। তারপর

গভীর জঙ্গলে শিকারে যাওয়ার পথে

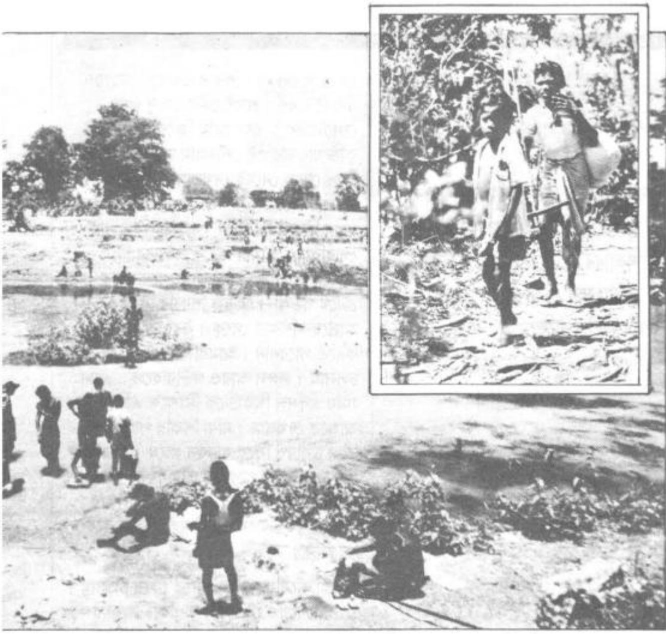

নামবে উরমা স্টেশনে। কারণ, উরমা দিয়ে হেঁটে অযোধ্যা পাহাড় মাত্র তিন কিলোমিটার। ওই দিক দিয়ে পাহাড়ে উঠলে জঙ্গলটাও কাছে পড়ে। শিকার করার পর পাহাড় থেকে নেমে ট্রেন ধরারও সুবিধে হয়। আমরা পুরুলিয়ায় নেমে গাড়ি ভাড়া করে চললাম অযোধ্যা পাহাড়ে। ১২০০ ফুট উঁচু এই অযোধ্যা পাহাড়ের আয়তন ৯৮·২০ বর্গকিলোমিটার। এর আশেপাশে ছড়িয়ে আছে চেমমটু, গজাবুরু, মাঠাবুরু, উসুলডুংরি, পানগড়া, চন্দনপানি নামের অনেক শৃঙ্গ। অযোধ্যার মোড় দিয়ে কিছুটা উঠলেই সামনে পড়বে টুরগা নামের সুন্দর ঝরনা। আরও কিছুটা উঠলে ডান দিকে পড়বে বামনি ওয়াচিং টাওয়ার। বনবিভাগ থেকে এই টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে বুনো হাতির দল আসছে কি না দেখার জন্য।

মোট ৭৮টি গ্রাম আছে। এইসব গ্রামে আদিবাসীদের বাস। সাঁওতাল, হো, মুন্ডা, বীরহোড় গোষ্ঠীর মানুষই বেশি। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। মাঝে-মাঝে ছোট গ্রাম। গ্রামগুলির নামও চড়াই-উতরাই ভেঙে ওঠেন পাহাড়ে। সন্ধ্যার সময় ঢুকে যান বনের ভেতর। আর তখন চতুর্দশীর চাঁদ ওঠে। সারা পাহাড়, অরণ্য ভরে যায় চাঁদের আলোয়। তখনই শুরু হয় শিকার পরবের পালা।

বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা শিকারিরা অন্য দলের সঙ্গে মেশেন না। প্রতিটি দল আলাদাভাবেই শিকার করেন। বনের মধ্যে ঢুকে বয়স্ক মানুষটি, যিনি গাঁওবুড়ো, তিনি সবাইকে দাঁড় করান কোনও গাছের তলায়। তারপর পুব দিকে হেঁটে গিয়ে কোনও একটি সুন্দর পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। এবং সেই পাথরটিকে পুজো করা হয় মারাংবুরুর নামে। তারপর দলের সবাই এসে পাথরটিকে প্রণাম করেন। বনদেবীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে ঢুকে পড়েন অরণ্যের ভেতর। প্রতিটি দলের নিজস্ব সাঙ্কেতিক শব্দ থাকে। সমস্ত রাত ধরে বনের জন্তুদের তাড়া করা হয়। পটকাও ফাটানো হয় কখনও-কখনও। রাত্রে চাঁদের আলোয় জন্তু মারা যায় না বেশি। তবে জঙ্গলের ভেতর মোটা দড়ি অথবা নাইলনের জাল পাতা হয়। কুড়ি-পঁচিশ ফুট জালের দু' ধারে গাছের ডাল কেটে পুঁতে দেওয়া হয়। আর ডালপালা দিয়ে ঝোপঝাড়ের মতো তৈরি করা হয়। যাতে তাড়া খাওয়া বন্য প্রাণীরা বুঝতে না পেরে জালে ঢুকে পড়ে। তারপর শিকারিদের ধারালো অস্ত্রের শিকার হয় তারা।

শিকার নিয়ে অনেক গোলমালও হয়। যেমন কোনও প্রাণী একটি দলের অস্ত্রের আঘাতে আধমরা হয়ে অন্য একটি দলের জালে পড়ল, অথবা অন্য দলের অস্ত্রের আঘাতে মারা গেল, তখন মৃত প্রাণীটির অধিকার কে পাবে তাই নিয়ে শুরু হয় বিবাদ। খবর যায় ওঝা বা কোনও বয়স্ক মানুষের কাছে। তিনি সেই বিবাদের মীমাংসা করেন।

রাম সীতা লক্ষ্মণ বনবাস-জীবনে নাকি অযোধ্যা পাহাড়ে আড়াই দিন ছিলেন। সীতা যখন তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছেন, তখন রামচন্দ্র মাটি ও আকাশকে জল চেয়ে ব্যর্থ হন। শেষে মাটিতে তীর গেঁথে জল তোলেন। বুড়বুড়ির কাছে এখনও সে গর্তটি নাকি বনের ভেতরে আছে। আদিবাসীদের তাই বিশ্বাস।

চতুর্দশীর রাতে বন্য জন্তুরা যখন প্রাণের ভয়ে ছোটাছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, শিকারিরাও তখন শিকারের আশা ছেড়ে দেন। বুদ্ধপূর্ণিমার দিন ভোরের আলোয় যখন মুখোমুখি হয় শিকারি ও প্রাণী, তখনই আসলে শুরু হয় শিকারপর্ব। এভাবে চলতে থাকে। বেলা বাড়ে। দুপুরের মধ্যে সমস্ত শিকারি, শিকার মিলুক আর না মিলুক, নেমে আসেন সমতল ভূমিতে।

সীতাচাটান, বুড়বুড়ি ও বাগান্ডী গ্রামের আশপাশে। কেউ-কেউ শিকার পান, কেউ-কেউ পান না। তবে বনের ভেতর থেকে রান্নার জন্য কাঠ আর গাছের ডাল কেটে আনেন। এ সময় গাছের ডালে নতুন পাতা। শুকনো কাঠ দিয়ে রান্না করেন। আর গাছের ডালগুলো মাটিতে পুঁতে দেন। এতে ছায়া হয়, সেই ছায়ার তলায় বিশ্রাম নেন আদিবাসী-শিকারিরা।

এ শিকার-পরব ক্রমেই পিকনিকের চেহারা নিচ্ছে। কারণ শিকার খুব কম মিলছে। জঙ্গল কেটে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কাঠের চোরাকারবারিরা জঙ্গলের গাছ কাটছে। কিন্তু শিকার-উৎসব থেকে যাচ্ছে। চাণ্ডিল থেকে তেরোজনের একটা দল এসেছেন জিপ ভাড়া করে। গাড়িতে আছেন কালুরাম সোরেন। গাড়িতে দিশি মুরগি চাল-ডাল সবই এনেছেন এঁরা। রান্না করে খেয়ে চলে যাবেন। সমস্ত সীতাচাটান মেলায় জমজমাট। মেলায় ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে। মাছও পাওয়া যায়।

বাগমুণ্ডী থানার বড়োরিয়া গ্রামের শক্তি মাছুয়ার বিক্রি করছেন শূকরের মাংস, কুড়ি টাকা কেজি। বরাভূম থেকে লোক এসেছেন, মনোমোহিনী পানের খিলি বেচছেন। মাটির হাঁড়ি, তেল, নুন চাল সবই পাওয়া যায় মেলায়। তবে এই শিকার উৎসবে কোনও মহিলার অংশগ্রহণ একদম নিষেধ। বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে হয় 'সেঁদরাই এনেই এন সেরেঙ' শিকারের গান। সেখানে পুরুষ মেয়ে সাজেন। কেন্দ্রী (বেহালার মতো যন্ত্র) ও বাঁশি বাজে সারারাত।

সুন্দর—উসুলডুংরি, ডাংরিডি, সরামচাকি, বামনিজারা, কুসুমটিকাই, বিটপানি, হাতিনাদা, ছাতনি। তিনটি মূল জঙ্গল আছে—গোবরিয়া, বামনিয়া ও মাঠারেঞ্জ। এক-একটা জঙ্গলের আয়তন ৩০০-৪০০ একর।

বুদ্ধপূর্ণিমার আগের রাত। রাত এগারোটা নাগাদ শুয়ে পড়লাম আমরা ট্যুরিস্ট লজে। ঘুম ভাঙল মাঝরাতে ধামসার শব্দে। হুড়মুড় করে উঠে দেখলাম বিরাট একটা শিকারির দল চলেছেন হইহই করে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে জঙ্গল। ধামসা-কাঁসর বাজিয়ে তীর-ধনুক, বল্লম, টাঙ্গি নিয়ে শিকারে চলেছেন এরকম এক-একটি দল।

ভোরে উঠে আমরা যাব শিকার-উৎসব দেখতে। সঙ্গে ছিল আমার স্ত্রী শ্রাবণী। অনেক কৌতূহল নিয়ে এসেছিল, কিন্তু শ্রাবণী

ঘুম ভাঙল মাঝরাতে ধামসার শব্দে। হুড়মুড় করে উঠে দেখলাম বিরাট একটা শিকারির দল চলেছেন হইহই করে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে জঙ্গল। ধামসা-কাঁসর বাজিয়ে তীর-ধনুক, বল্লম, টাঙ্গি নিয়ে শিকারে চলেছেন এরকম এক-একটি দল।

গোবরিয়া জঙ্গলে শিকারের খোঁজে, (ইনসেট) ঐরা এসেছেন দূর-দূরান্ত থেকে *ফোটো : গৌতম দাস*

যেতে পারল না। শিকার-উৎসবে মেয়েদের যাওয়া বারণ। শ্রাবণীকে রেখে দু'জন ফোটোগ্রাফার এবং আমি জিপে করে মিনিট কুড়ি যাওয়ার পর পৌঁছলাম জঙ্গলের মুখে। জিপ থেকে নেমেই দেখলাম, গাছের তলায় জটলা করছেন কয়েকজন আদিবাসী। তাঁরা হরিণ শিকার করেছেন। এই জঙ্গলের নাম গোবরিয়া। আমরা গভীর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চললাম। অনেকটা এগনোর পর চোখে পড়ল—একদল শিকারি ফিরে আসছেন শিকার থেকে। ওঁরা কিছু শিকার করতে পারেননি। আমরা আরও এগিয়ে চললাম। জঙ্গল আরও গভীর হচ্ছে। এমন সময় একদল শিকারিকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে দেখলাম। যাঁরা শিকার পাচ্ছেন না, তাঁরা চুপচাপ ফিরে যাচ্ছেন গ্রামে। আর যাঁরা শিকার করতে পেরেছেন তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন ধামসা-কাঁসর বাজিয়ে। একটি দল শিকার করেছে শূকর, আর-একটি দল শিকার করেছে খরগোশ।

আমরা অযোধ্যা গ্রামের দিকে ফিরে চললাম। ফেরার পথেও দেখা হল দু-একটি শিকারি দলের সঙ্গে।

শিকার করে ফিরে আসার পরই শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। গত রাত থেকে সকাল পর্যন্ত শিকারিরা কিছু শিকার পান বা না পান, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দুপুরে সবাই জড়ো হন একটি জায়গায়। সেই জায়গাটির নাম সীতাচাটান। লোকে বলে—বনবাসে যাওয়ার সময় সীতা এখানকার একটি পুকুরে স্নান করেছিলেন, তাই এই জায়গার এরকম নাম। শিকারিরা এখানে এসে পুকুরে স্নান করলেন। তারপর মাটির হাঁড়িতে শুরু করলেন রান্না। এর পর খাওয়াদাওয়ার তোড়জোড়। আনন্দে মুখর হয়ে উঠল সীতাচাটানের প্রান্তর। এর পর শিকারিদের ঘরে ফেরার পালা।

অযোধ্যা পাহাড়ে এই শিকার-উৎসবের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল অন্য। আগে এখানে বসত বিচারসভা। এখানে হত সর্বশেষ স্তরের বিচার। সারা বছর গ্রামে যতরকম অন্যায়-অবিচারের মীমাংসা করা সম্ভব হত না, তার সমাধান হত এখানে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীরাই নন, বিহার অসম ও ওড়িশার আদিবাসীরাও এই শিকার-উৎসবে যোগ দিতে আসেন। এঁরা জীবনে একবার অন্তত শিকারে যাবেনই। কেননা, শিকার-উৎসবে যোগ দেওয়া এঁদের কাছে শৌর্যের প্রতীক। এঁরা যে একসময় পুরোদস্তুর শিকারি ছিলেন, এ উৎসব হয়তো তারই প্রমাণ।

ফোটো : দীপক ভট্টাচার্য

ক্যাম্পাস

জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়ায় বাংলার ছাত্রছাত্রীরা

ছোট্ট মেয়ে তাপসী বাউর হইচই ফেলে দিয়েছে। হুগলি জেলার মফস্বলের একটি স্কুলের ছাত্রী তাপসী সাব জুনিয়ারদের জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় (মিনি) মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। অ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন ইভেন্টে সে পেয়েছে চার-চারটি সোনার পদক। তাপসীর মতো আর-এক চ্যাম্পিয়ান বিদ্যুৎ ঘোষ। নৈহাটি গড়িফা হাই স্কুলের ছাত্র বিদ্যুৎ দুটি সোনা, একটি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে ছেলেদের বিভাগে। ৪-৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শোলাপুরে অনুষ্ঠিত সাব জুনিয়ারদের (বয়ঃসীমা ১৪ বছর কিংবা অষ্টম শ্রেণী) এই জাতীয় প্রতিযোগিতা থেকে বাংলার ছেলেমেয়েরা অনেক পদক নিয়ে এসেছে। সব বিভাগেই বাংলার জয়জয়কার। অ্যাথলেটিকস এবং সাঁতারে ছেলেদের ও মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ান। টেবিল টেনিসে মেয়েরা চ্যাম্পিয়ান, ছেলেরা রানার্স। জিমনাসটিকসে মেয়েরা রানার্স। ছেলেরা চতুর্থ। পদক-সংখ্যার বিচারে দল হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারও পেয়েছে বাংলা। শোলাপুরে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার বিভিন্ন স্কুলের ৩৭ জন মেয়ে এবং ৩৮ জন ছেলে অংশ নিয়েছিল এই প্রতিযোগিতায়।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মিলখা সিং

প্রশিক্ষক গিয়েছিলেন ১০ জন। শোলাপুরের পর ত্রিবান্দ্রামে ১২-১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বসেছিল উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এখানে দুটি গ্রুপ ছিল। 'সিনিয়ার বয়েজ অ্যান্ড গার্লস' ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত এবং 'জুনিয়ার বয়েজ অ্যান্ড গার্লস' ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত। জিমনাসটিকস এবং অ্যাথলেটিকসের দুটি গ্রুপেই বাংলার ছেলেমেয়েরা অংশ নিয়েছিল। বাংলা পদক পেয়েছে : সোনা—আটটি, রুপো—চারটি অ্যাথলেটিকসে ও একটি জিমনাসটিকসে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায়, ব্রোঞ্জ—তিনটি অ্যাথলেটিকসে এবং দুটি জিমনাসটিকসের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায়। দলগত ব্রোঞ্জ সিনিয়ার ছেলে ও মেয়েদের জিমনাসটিকসে।
পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট ৩৩ জন ছেলে ও ৩১ জন মেয়ে গিয়েছিল। জেলাস্তর এবং রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা থেকে প্রতিযোগীদের নির্বাচন করা হয়েছিল। বাংলা দলের ম্যানেজার ছিলেন হুগলির শারীরশিক্ষা সংগঠক কানাইলাল জাটি। তিনি এবং রাজ্য শারীরশিক্ষা দফতরের সহ অধিকর্তা সুখেন্দুশেখর গুপ্ত ত্রিবান্দ্রামের ফলাফলে খুশি হতে পারেননি। তিনি বলেছেন, "ফলাফল আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।"

অঞ্জন সিকদার

স্কুলে ফুলের মেলা

ফুলের মেলার আয়োজন করছে ছেলেরা *ফোটো : অলক সরকার*

হাওড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়ের মাঠে সবুজের মেলা বসেছিল। এই স্কুল হাওড়া শহরের নামকরা স্কুল, পরীক্ষার ফলাফলে যেমন, তেমনই খেলাধুলোয় এবং অন্যান্য সেবামূলক কাজেও। স্কুলের মাঠে দেখি ফুটে আছে আট-ন'শো ফুল, নানা রঙের, নানা আকারের। ফুলগাছের পাশে-পাশে ফুলের ও গাছের কবিতা লিখে সুন্দর পোস্টারও টাঙিয়েছিল ছাত্ররা। রবীন্দ্রনাথ থেকে শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জয় গোস্বামী প্রমুখ কবির কবিতাই পোস্টারে ছিল। জানা গেল, এই পরিকল্পনাটা এসেছিল সাহিত্যের শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রথমে, তাঁরা ভেবেছিলেন সৌন্দর্যবোধের দিক থেকে। কিন্তু তারপর বিজ্ঞানের শিক্ষকরা যোগ করে দিয়েছেন পরিবেশ দূষণের প্রসঙ্গ। একইসঙ্গে সৌন্দর্যবোধের চর্চা, পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে লড়াই এবং দায়িত্ববোধের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে ছাত্ররা। তারা সংগ্রহ করেছে দেশ-বিদেশের ফুল, গাছ, প্রকৃতি বিষয়ক প্রাসঙ্গিক কবিতার পঙক্তি। কিউবা বা জার্মান কবির লাইনও ঝুলছিল শঙ্খ ঘোষ বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদে।
ছাত্র-অধিনায়ক শান্তনু আঢ্য-র সঙ্গে কথা বলছিলাম। সে জানাল, অকালবর্ষণে তাদের মাঠে জল জমে গিয়েছিল, ছাত্ররাই কোদাল চালিয়ে নালা কেটে, চুন সুরকি ছড়িয়ে মাঠ শুকনো করেছিল, তারপর আলপনা দিয়ে, সাজিয়ে, বসিয়েছিল নানা রঙের ফুলের মেলা।

অভীক মজুমদার

বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে

প্রতিবন্ধীদের কথা বলা শেখাবে কম্পিউটার

কানে যাঁরা কম শুনতে পান তাঁদের বেশিরভাগেরই স্পষ্টভাবে কথা বলার অসুবিধে থাকে। অনেকে আবার বোবাই থেকে যান। এই জাতীয় প্রতিবন্ধীদের ধীরে-ধীরে অত্যন্ত কষ্ট করে শব্দ করার কৌশল শেখাতে হয়, শেখাতে হয় সহজ-সরল শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণ। পশ্চিম জার্মানির সিমেন্স কম্পানি সম্প্রতি 'কম্পিউটারাইজড্ স্পিচ ট্রেইনার' তৈরি করেছেন এই প্রতিবন্ধীদের কথা ভেবেই। এই ধরনের প্রতিবন্ধীরা যখন কোনও শব্দ উচ্চারণের চেষ্টা করেন, তখন ধ্বনিবিচার করে কম্পিউটারের রঙিন পরদায় শব্দটির বানান ফুটে ওঠে। উচ্চারণ যদি খুব স্পষ্ট হয় তা হলে পরদার বানানের অক্ষরগুলোও স্পষ্ট ও নিখুঁত হয়। আবার উচ্চারণ অস্পষ্ট, বিকৃত বা দুর্বোধ হলে পরদার অক্ষরগুলোও সেইরকম হয়। এই বিকৃতিরও আবার দশরকম শ্রেণীবিভাগ করা আছে। ফলে কোনও প্রতিবন্ধী যখন কম্পিউটারে বসে উচ্চারণের শিক্ষা নেন তখন কম্পিউটারের পরদায় ফুটে ওঠা তাঁর উচ্চারণের শব্দলিপি তাঁকে জানিয়ে দেয় তাঁর উচ্চারণ ঠিক কতটা নিখুঁত হয়েছে। একই শব্দ বারবার উচ্চারণ করে তিনি দেখে নিতে পারেন তাঁর উচ্চারণ শেখার কাজ কতটা এগোচ্ছে।

এইসব প্রতিবন্ধীদের শেখানোর জন্য কী কী শব্দ বা বাক্য উপযুক্ত সেটা বেছে দেন বিশেষজ্ঞের দল। তারপর সেই শব্দ ও বাক্য সঞ্চয় করে নেওয়া হয় ফ্লপি ডিস্কে। প্রতিবন্ধী ছাত্র উচ্চারণের ব্যাপারে কতটা পারদর্শী হয়ে উঠছে তার জন্য কম্পিউটারই পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করে। সঠিক উচ্চারণের সঙ্গে ছাত্রের

বিকৃত উচ্চারণ তুলনা করে কম্পিউটার তার টিভি পরদার মাধ্যমে গ্রেড জানিয়ে দেয়। এই ধরনের কম্পিউটার-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শুধু যে বধির বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তা নয়। যেসব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কোনও দুর্ঘটনায় বা অসুখে বাকশক্তি হারিয়েছেন তাঁদের চিকিৎসার কাজেও এই যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

কম্পিউটারে মমি পরীক্ষা

একজন চিকিৎসক, আর-একজন সংগ্রহশালার সহ-তত্ত্বাবধায়ক— এই দু'জনে হাত মিলিয়েছেন তিন হাজার বছরেরও বেশি পুরনো মিশরীয় মমির রহস্যভেদের জন্য। কী রয়েছে ওইসব মমির লিনেনে জড়ানো আস্তরণের আড়ালে? প্রথমজন মায়রন মার্ক্স, সান ফ্রান্সিসকোর রেডিওলজিস্ট। দ্বিতীয়জন সু দ'রিয়া, বস্টনের মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস-এর সহ-তত্ত্বাবধায়ক। দু'জনে এখন নানা ধরনের মমি পরীক্ষা করছেন কম্পিউটার টোমোগ্রাফির সাহায্যে। এর ফলে মমি অবিকৃত রেখে তার অভ্যন্তরে ক্রমবীক্ষণের কাজ চালানো যায় এবং তার ত্রিমাত্রিক চিত্র গঠন করা যায় কম্পিউটারের টিভি পরদায়। এইভাবে প্রথম যে-ছবিটি তাঁরা গঠন করেছেন সেটি একজন অল্পবয়সী গায়িকার। মিশরীয় এই মন্দির-গায়িকার নাম টেব্‌স। তাঁর ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে সময়ের ছাপ পড়েছে ত্বকে, আর অজ্ঞাত রাসায়নিকের প্রভাব পড়েছে চুলে। এইরকম অন্যান্য আরও মিশরীয় মমির কম্পিউটার টোমোগ্রাফি করে এই দুই গবেষক জানতে পেরেছেন, সে-কালের মিশরীয়দের পিঠে ব্যথার সমস্যা ছিল, ছিল নানা পরিচিত রোগ। যেমন, নেস-টা নামে সে-কালের এক পরামানিক মারা গেছে দাঁতের রোগ থেকে। দাঁতের পোকা থেকে তার ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছিল মস্তিষ্ক পর্যন্ত।

এখন মার্ক্স ও দ'রিয়া মমির আরও নতুন নতুন রহস্য উন্মোচনের কাজে ব্যস্ত।

জার্মানির প্রথম যোগাযোগ-উপগ্রহ

১৯৮৩ সালে প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আর গত বছরের জুলাই মাসে তা রূপায়িত হয় বাস্তবে। জার্মানির প্রথম যোগাযোগ-উপগ্রহ স্থাপিত হয় মহাকাশে। ১৯৮৯ সালের ৬ জুলাই স্থানীয় সময় সকাল সাতটা সাঁইতিরিশ মিনিটে ফ্রেঞ্চ গায়ানার কুরু মহাকাশ-কেন্দ্র থেকে ইউরোপের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী উড়ান-যন্ত্র 'এরিয়েন ফটিফোর-এল' উপগ্রহটিকে মহাকাশে নিক্ষেপ করে। উপগ্রহটির নাম 'কোপারনিকাস'। যে-তিনটি যোগাযোগ-উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এটিই তাদের প্রথম। সমগ্র প্রকল্পটির আনুমানিক খরচ পাঁচশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিষুবরেখা থেকে ৩৬০০০ কিলোমিটার ওপরে ভূসমলয় কক্ষে স্থাপিত কোপারনিকাস কমপক্ষে দশ বছর ধরে নিখুঁতভাবে কাজ করে যাবে। কোপারনিকাসের দু' ডানায় মোট

রকেট এঞ্জিন চালু করা মাত্র সংঘর্ষের হিসেবনিকেশ

অ্যালবিউকোয়্যারকিউ-র স্যান্ডিয়া ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির কর্মীদের কাছে দিনটা ছিল অন্য আর পাঁচটা দিনের মতোই গতানুগতিক। লাঞ্চ প্যাক করে গাড়ি চালিয়ে অফিসে যাও, একটু কফি খাও, একুশ টন ওজনের একটা এফ-ফোর ফ্যান্টম জেট প্লেনকে ঘণ্টায় ৪৮০ মাইল বেগে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা কংক্রিটের দেওয়ালে ধাক্কা মারো, রোজকার চিঠিপত্রের উত্তর দাও, তারপর সোজা বাড়ি।

এখানকার প্রযুক্তিবিদেরা ট্রাক থেকে শুরু করে ক্ষেপণাস্ত্র— প্রায় সব-কিছুই কংক্রিটের দেওয়াল তাক করে ছুঁড়ে দিয়েছেন বিপজ্জনক গতিতে। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য, এইসব যানের সংঘাতের গতিবেগ ও তাদের কাঠামোর গঠনগত শক্তির সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা। সম্প্রতি এই ধরনের একটি সংঘর্ষে যে এফ-ফোর ফ্যান্টম জেট প্লেনটি 'মৃত্যুবরণ' করল তার সংঘাতকালীন যাবতীয় তথ্যের সাহায্যে প্রযুক্তিবিদেরা সংঘাত-সহনশীল দেওয়ালের কারিগরি নকশা তৈরি করতে চান। এই দেওয়াল নিউক্লীয় বিদ্যুৎ-কেন্দ্র বা বিমান-বন্দরের কাছাকাছি ঘর-বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এফ-ফোর বিমানের সংঘর্ষের পরীক্ষার যাবতীয় খরচ বহন করেছিল জাপানের মিউটো ইনস্টিটিউট অব স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স। এই পরীক্ষার সময় ২০০০ ফুট লম্বা ট্র্যাকের এক

১৯৬৫৬টি সৌরকোষ বসানো আছে। সৌর প্যানেলের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে পনেরো মিটার। তবে কোপারনিকাসের উচ্চতা মাত্র ৪·১৫ মিটার আর নিক্ষেপ করার সময় তার ওজন ছিল ১·৪ টন।

কক্ষপথে পরিক্রমা করতে করতে কোপারনিকাস যখনই পৃথিবীর ছায়াময় অংশে চলে আসবে তখন

সৌরকোষ ঠিকমতো কাজ করতে পারবে না। সে-সময়ে তাকে শক্তি জোগাবে দু'টি রিচার্জেবল নিকেল-ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই জার্মানির যোগাযোগ-ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ নিয়েছে কোপারনিকাস। এর ফলে জার্মানিতে শুরু হয়ে গেছে যোগাযোগ-ব্যবস্থার নতুন যুগ।

্যান্টম জেট ছুটতে শুরু করে। ২০০০ ফুট পথ পার হয়ে যায় মাত্র ৬ সেকেন্ডে।

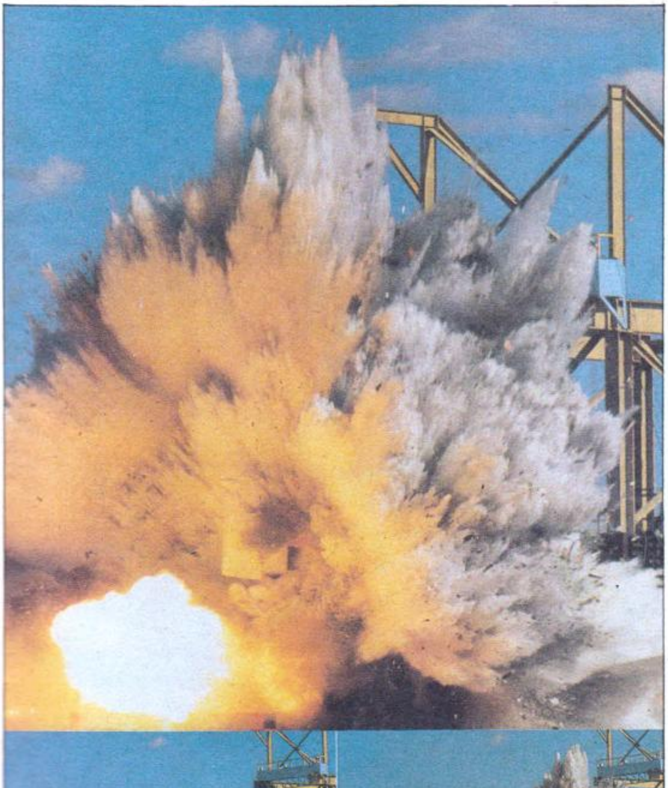

প্রান্তে গবেষকরা তৈরি করেছিলেন দশ লক্ষ পাউন্ড ওজনের একটি কংক্রিটের দেওয়াল। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২৩ ফুট মাপের দেওয়ালটি ছিল ১২ ফুট পুরু। আর ট্র্যাকের অন্য প্রান্তে ছিল হতভাগ্য ফ্যান্টম বিমানটি। মাত্র ০·৩৭ মাইল দূরত্ব অতিক্রমের মধ্যেই প্লেনটির গতিবেগ শূন্য থেকে ঘণ্টায় ৪৮০ মাইলে তুলতে প্রযুক্তিবিদেরা ৪১টি রকেট এঞ্জিনের সাহায্য নিয়েছিলেন। জ্বালানিসমেত একটি ফ্যান্টম জেটের পুরো ওজনের হিসেব পেতে পরীক্ষাধীন প্লেনটির জ্বালানি ট্যাঙ্কে ভরে দেওয়া হয়েছিল ৯৬০০ পাউন্ড জল।

রকেট এঞ্জিন চালু করা মাত্রই ফ্যান্টম জেট ছুটতে শুরু করে। ২০০০ ফুট পথ পার হয়ে যায় মাত্র ৬ সেকেন্ডে। মরুভূমি কাঁপিয়ে ধাক্কা মারে কংক্রিটের দেওয়ালে এবং সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। সংঘাতের মুহূর্ত থেকে প্লেনের মন্দনের হিসেব রাখতে ব্যবহার করা হয়েছিল ১২টি অ্যাক্সিলারোমিটার। এদের সংকেত পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল কাছাকাছি একটি কম্পিউটারে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এই সংঘর্ষে দেওয়ালটির গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। এর প্রধান কারণ, দেওয়ালটি বসানো ছিল বায়ু-বেয়ারিং-এর ওপরে। তবে সংঘর্ষের ফলে দেওয়ালটি ৫ ফুট পিছনে সরে গিয়েছিল। ছবিতে সংঘর্ষের মুহূর্তটি ধরা পড়েছে।

যান্ত্রিক খেলনা

একসময় যান্ত্রিক খেলনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা-মহারাজারা। যাঁরা যান্ত্রিক খেলনা তৈরি করতেন, সাধারণ মানুষ তাঁদের জাদুকর বলে ভাবতেন। লিখেছেন গৌতম চক্রবর্তী ও স্বপ্নাতীত সরকার

ডি ভ্যাকাসনকে তার শিক্ষকরা শেষ পর্যন্ত স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মেধাবী ও চঞ্চল ভ্যাকাসন মাত্র কয়েক বছর আগে এই স্কুলে যোগদান করেছে। এখান থেকে পাশ করে তার ধর্মযাজক হওয়ার ইচ্ছে। মধ্যযুগে ইউরোপের অধিকাংশ ছাত্রেরই সেরকম ইচ্ছে হত।

প্রথাগত লেখাপড়ার বাইরে সব কিছুতেই তার ভীষণ উৎসাহ। প্রায়ই সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দ্যাখে বড়-বড় দোলন-ঘড়িতে কীভাবে দম দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি সে অবসর সময়ে বসে বসে কয়েকটি দেবদূতের মূর্তি তৈরি করেছে, ঘড়ির মতোই এগুলিতে দম দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। চাবি দিলেই এই দেবদূতের মূর্তিগুলি কিছুটা বাতাসে ভেসে যায়, আবার ধপ করে মাটিতে নেমে আসে।

এই অপরাধেই ভ্যাকাসনের শিক্ষকরা তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলেন। শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু, ভ্যাকাসন ঈশ্বর নয়। তা হলে তার মূর্তিগুলি লাফাচ্ছে কেন? ও নিশ্চয় শয়তানের অনুচর, সাক্ষাৎ শয়তান ওকে দিয়ে এগুলি সৃষ্টি করিয়েছে। না, শয়তানের অনুগ্রহপুষ্ট এরকম ছাত্রকে এই

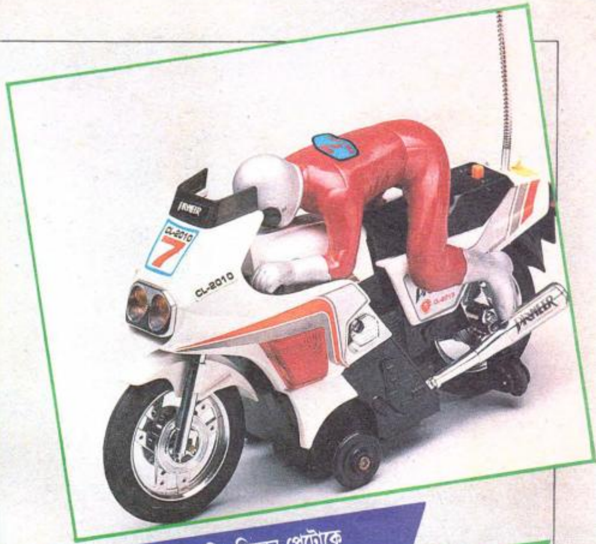

এরিখটাস অবাক করে দিয়েছিলেন প্লেটোকে

বিজ্ঞানীরা ঢুকে পড়েছেন খেলাধুলোর জগতে

লেসার-গান নিয়ে বান্টি যাবে ফ্ল্যাশ গর্ডনের কাছে

স্কুলে রাখা উচিত নয়।
ভ্যাকাসনের শিক্ষকরা ট্যারেন্টাস নগরীর এরিখটাস-এর কথা জানতেন না। এরিখটাস গ্রিক সভ্যতার একজন বিশিষ্ট যন্ত্রবিদ, অঙ্কবিদ পিথাগোরাস তাঁর শিক্ষক ছিলেন। কয়েকটি কাঠের পায়রা দেখিয়ে এরিখটাস একবার প্লেটোকেও অবাক করে দিয়েছিলেন।
পায়রাগুলিতে সঙ্কুচিত গরম বাতাস ভরা ছিল, ছেড়ে দিলে তারা কিছুটা ওপরে উঠে নীচে নেমে আসত।
ডি. ভ্যাকাসন বা এরিখটাসকে এখনকার যান্ত্রিক খেলনা প্রস্তুতকারকদের পূর্বসুরী বলা যায়।
তবে, মধ্যযুগের এইসব খেলনা আকারে ছিল বেশ বড়সড়, তৈরি করতে অনেক খরচ হত। রাজা-মহারাজারা ছিলেন এসব যান্ত্রিক

নেপোলিয়ন সেই প্রথম হেরে গিয়েছিলেন

মনে হয় যেন লেসার বিম ছিটকে বেরোচ্ছে

পুতুল-পাইলট বন্দুক চালাতে শুরু করে

বহু বালক-বালিকাই রোবট নিয়ে খেলা করে

খেলনার পৃষ্ঠপোষক। মুখ্যত তাঁদেরই উৎসাহ এবং অর্থেই এগুলি তৈরি করা হয়েছিল। এইসব যান্ত্রিক খেলনা দেখে তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতেন। ফ্রান্সের তুলিয়ের প্রাসাদে এবং সেন্ট জারমেন নগরীতে বছরে একবার বিশাল মেলা ও উৎসব হত। এই খেলনা-প্রস্তুতকারকরা ওই উৎসবে মানুষপ্রমাণ মূর্তিগুলি নিয়ে হাজির হত। মেলায় আসা মানুষরা ভিড় করে এসব মূর্তির নড়াচড়া দেখে আনন্দ পেত ও পয়সা দিত। এই যান্ত্রিক খেলনা প্রস্তুতকারকদের সাধারণ মানুষরা ক্ষমতাবান জাদুকর বলে

মনে করত। খেলনা যে কত শস্তা হতে পারে এবং ছেলেমেয়ের বিনোদনের সামগ্রী হতে পারে, সেসব কথা তখনও কেউ ভাবেনি। এখনকার ছোট-ছোট যান্ত্রিক খেলনার পূর্বসূরি হল জার্মানি। জার্মানি-ই প্রথম ব্যাপকহারে ছোট-ছোট দম দেওয়া খেলনা তৈরি শুরু করে।
আসলে, এতদিনে ঘড়ির অনেক উন্নতি হয়েছে, হাত-ঘড়িতে দম দেওয়ার জন্য একটি স্প্রিং থাকে। স্প্রিংটি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে শক্ত করে এঁটে দিতে হয়, এতে গতিশক্তি স্থিতিশক্তিরূপে সঞ্চিত থাকে। এবার ঘড়ির কাঁটা সেই গতিশক্তিতে টিক-টিক করে চলতে আরম্ভ করে। চাবি দেওয়া খেলনাতেও হুবহু ওই একই পদ্ধতি! চাবি-দেওয়া ছোট্ট পুতুল যখন মাথা নাড়ে, চাবি দেওয়া গাড়ি বা মোটর সাইকেল যখন ঘরের মেঝের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়ায়, তখন আমরা কেউ নিজের হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি না!
এই-সময় শুরু হল ঘর্ষণ-পদ্ধতি। এখনকার যে খেলনা গাড়িগুলি মেঝেতে ঘষে দিলে গড়গড় করে এগিয়ে যায়, সেগুলি ঘর্ষণ-পদ্ধতিতে চলে। যে চাকাটি গতি নিয়ন্ত্রণ করে, সেটিকে মেঝেতে ঘষে দিতে হয়। এই চাকাটি একটি অক্ষদণ্ডকে কেন্দ্র করে থাকে, অক্ষদণ্ডের সঙ্গে খেলনা গাড়ির খেলনা চাকাটি যুক্ত। অক্ষদণ্ড ঘুরলে খেলনা চাকাটিও ঘুরতে থাকে, সঞ্চিত ভরবেগ-এর জন্য গাড়ি এগিয়ে যায়। পদার্থবিজ্ঞানের বলবিদ্যার প্রথম কথাই হল এই ভরবেগ আর ঘর্ষণবল। জার্মানির নুরেমবার্গ প্রদেশের

আমেরিকার পুরনো একটি খেলনা গাড়ি, ১৮৯০

নেপোলিয়ন যে খেলনার কাছে হার মেনেছিলেন

কাঠের খেলনা 'তুর্কি' এক নিমেষে ডিউক অব ওয়েলিংটনের যাবতীয় গর্ব ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছে নয়, তুর্কি'র কাছেই নেপোলিয়ন তাঁর জীবনের প্রথম পরাজয় স্বীকার করেছিলেন।
ব্যারন উলফগ্যাং ভন কেম্পেলেন নামে এক হাঙ্গারীয় প্রথম এই খেলনাটি তৈরি করেন। বিশাল এক ক্যাবিনেট-টেবিলের ওপাশে তরবারি হাতে নিয়ে বসে আছে এক কাঠের তুর্কি-পুরুষ। তার পরনে রঙিন চোগা-চাপকান, মুখে বিশাল গোঁফ। ক্যাবিনেটের ওপর একটি দাবার বোর্ড ও দাবার ঘুঁটি। পৃথিবীর যে-কোনও মানুষের সঙ্গে তুর্কি দাবা খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুত। খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে ক্যাবিনেটের দরজাটি সশব্দে খুলে যায়, দেখা যায় সেখানে নানারকম যন্ত্রপাতি। তুর্কি দাবার ঘুঁটির চাল দিতে শুরু করলে, তার প্রতিটি দানের সময় কলকজার ঘট-ঘটাং শব্দ ওঠে!
১৭৮০ সালে কেম্পেলেন এটিকে অস্ট্রিয়ার রাজসভায় নিয়ে যান। অস্ট্রিয়া জয়ের পর স্বয়ং নেপোলিয়ন তুর্কি'র সঙ্গে দাবা খেলতে বসেছিলেন, তুর্কি তাঁকে হারিয়ে দেয়। ১৮২৬ সালে যোহান মেনজেল তুর্কিকে আমেরিকায় নিয়ে যান, ১৮৫৪ সালে ফিলাডেলফিয়া শহরে এক অগ্নিকাণ্ডে তুর্কি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

তুর্কির রহস্য আজও অজ্ঞাত। কেউ-কেউ বলেন, তুর্কির ভেতরে এক সত্যিকারের মানুষ-দাবাড়ু লুকিয়ে থাকত, সে চাল দিত। একজন কল্পবিজ্ঞানের লেখক বলেছেন, ওসব বাজে কথা! ওই যে ঘট-ঘটাং শব্দ হত, দাবাটা ছিল চুম্বকের, ঘুঁটিগুলোও ছিল চুম্বকের তৈরি। ক্যাবিনেটের ভিতরে তুর্কির ছিল নানারকম যন্ত্রপাতি। চাল দিলেই ঘুঁটির অবস্থান ঠিক করে দিত, চুম্বকের আকর্ষণে পরবর্তী ঘুঁটি বোর্ডের কোথায় গিয়ে বসবে। সব মিলিয়ে তুর্কি আজও রহস্যে ঘেরা।
সম্প্রতি এক কম্পিউটার-দাবাড়ু কাসপারভকে প্রায় নাকাল করে ছেড়ে দিয়েছিল। তুর্কি রহস্যের মীমাংসা হোক বা না হোক, তুর্কি নিজেকে স্বচ্ছন্দে এখনকার কম্পিউটার-দাবাড়ুদের পথিকৃৎ বলে দাবি করতে পারে।

যান্ত্রিক পুতুল 'মামি' 'ড্যাডি' বলে। মাথা নাড়ে। লন্ডনে ক্রিস্টির সংগ্রহে ছিল আর একটি পুতুল। তার জুতোর ভেতরে রোলার। সে হাঁটতে পারে।

খেলনা নির্মাতারা প্রথম এই পদ্ধতিটি কাজে লাগান। আইনস্টাইনের দেশের মানুষ যে পদার্থবিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে খেলনা বানাবেন, এতে আর আশ্চর্য কী ?
ফ্যারাডে ও এডিসনের দেশ ব্রিটেন প্রথম ব্যাটারিচালিত খেলনা বের করেছিল। এখন সেসব নিছক ইতিহাস। বিজ্ঞান কোনও দেশের নির্দিষ্ট মানচিত্রে বন্দী থাকতে পারে না। বিজ্ঞান ও খেলনা এখন একাকার।

বিজ্ঞানের এক-একটা নতুন আবিষ্কার হয়েছে, আর খেলনাজগৎ প্রবল বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেই আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়েছে। জেম্‌স ওয়াট বাষ্পীয় জাহাজ আবিষ্কার করার সঙ্গে-সঙ্গে ইউরোপের বাজার ভরে গিয়েছিল খেলনা ট্রেন আর খেলনা জাহাজে। প্রত্যেকটিতে খুব ছোট-ছোট বয়লার ছিল, তাতে জল গরম হলে বাষ্পের সাহায্যে সেই ট্রেন কু-ঝিকঝিক শব্দে ছুটে চলত।
উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকার নিউ হ্যাম্পটন শহরের 'গং বেল ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পানি' খেলনায় ঘণ্টা জুড়ে দিল। খেলনার ভেতরে লুকনো ছিল দুটি চাকা, চাকা দুটির সঙ্গে ছিল একটি অক্ষদণ্ড। খেলনার ভেতরের এই লুকনো অক্ষদণ্ডটির ওপরে একটি ঘণ্টা লাগানো ছিল। ফলে, খেলনা-পুতুল যখন নাচতে শুরু করত বা খেলনা গাড়ি যখন এগিয়ে যেত, তখন ঘণ্টাটিও ডিংডং শব্দে বাজতে থাকত।
প্যারিসের এক শহরতলিতে জুমাউ নামে এক ভদ্রলোকের খেলনার দোকান ছিল। ১৮৮০ সালে, জুমাউ পুতুলগুলির বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ 'বল এবং সকেট' পদ্ধতিতে স্থিতিস্থাপকভাবে লাগিয়ে দিলেন। মানুষের হাত কাঁধের সঙ্গে বল এবং সকেট পদ্ধতিতে যুক্ত, ফলে যেভাবে ইচ্ছে আমরা সেভাবে হাত ঘোরাতে পারি। কোনও স্থিতিস্থাপক জিনিস দিয়ে খেলনা পুতুলের হাত-পা বল এবং সকেট পদ্ধতিতে জোড়া দিলে কী হবে ? চাবি দিলে সেই পুতুল ইচ্ছেমতো হাত-পা নাড়াবে। পুতুলের মাথার ভেতরে যদি একটা স্থিতিস্থাপক তার ঢুকিয়ে তারটাকে চোখের গর্তে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, কী হবে ? পুতুল দাঁড়ালে তারটি টানটান হয়ে থাকবে, পুতুল অপলকে তাকিয়ে থাকবে। পুতুল মাথা বাঁকালে তারটি সঙ্কুচিত হবে, পুতুলের চোখের পাতা দুটোও বুজে আসবে।
জুমাউ-এর পুতুলকে আরও উন্নত করে তুলল আমেরিকার মার্টিন এবং বুনিয়ান কম্পানি। সুন্দর রঙিন ফ্রক এবং গাউন পরা পুতুল, ফ্রকের ভেতর একটা 'লিভার-সিস্টেম'

দেশপ্রেম ও হর্নবির সেই খেলনা

পিতলের বয়লারসহ স্টিম এঞ্জিন

এক কথায় বলা যেতে পারে অবিশ্বাস্য !
দেশপ্রেম অনেক বড় ব্যাপার, শিশুদের খেলনার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।
ফ্রাঙ্ক হর্নবি'র দেশপ্রেমের জন্য কিন্তু সমস্ত পৃথিবী আজ উপকৃত। লিভারপুল শহরের এই ব্রিটিশ দেশপ্রেমিক ১৯০১ সালে মাথা খাটিয়ে একটি জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন, সারা পৃথিবীর মানুষ সবাই আজ সেই জিনিসটি উপভোগ করছে। জিনিসটা আর কিছুই নয়, টয়-ট্রেন !
বলা বাহুল্য, রথের মেলার টয়-ট্রেন যে নীতিতে চলে, বসার ঘরের লাইন দিয়ে টয়-ট্রেনও সেই একই নীতিতে বৃত্তাকার পথে ঘুরপাক খায়। আজকাল অধিকাংশ বাড়িতেই জায়গার অভাব, রাজপুত্র আর রাজকন্যারাও এখন আর তাদের নিজস্ব 'খেলাঘর' তৈরি করতে পারে না। ড্রইং রুম বা বেড রুমের মেঝেতে স্টিলের রেললাইন পাতা হয়, একজোড়া বিস্ফারিত চোখের সামনে সেই ট্রেনটি লাইন ধরে কু-ঝিক-ঝিক শব্দে এগিয়ে যায়। সারা পৃথিবীই এই জিনিসটির সঙ্গে পরিচিত !
জার্মানি ও ব্রিটিশদের মধ্যে মাঝে-মাঝেই ঝগড়া বাধত। ঝগড়ার কারণ আর কিছু নয়, দু' দলের জাত্যভিমান।
এর ফলে আর কিছু না হোক, অন্তত নতুন নতুন খেলনা তৈরির ক্ষেত্রে চমৎকার একটা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছিল। দুটি দেশই পরস্পরকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টায় মেতে ওঠে। লাভ হয় শিশুদের। তারা এমন সব খেলনা পেল, যা আগে কখনও দেখা যায়নি।

১৯০১ সালে সারা ইউরোপের শিক্ষাবিদরা নতুনভাবে চিন্তা শুরু করেছিলেন। বইয়ের মাধ্যমে নয়, খেলনার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করতে হবে। এই সুযোগে একদল জার্মান নতুন একটি ধুয়ো তুলে দিলেন। তাঁরা বলতে শুরু করলেন, "আমাদের দেশের বিজ্ঞানশিক্ষাই শ্রেষ্ঠ। আমরা মডেল দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান শেখাই। ব্রিটিশদের দ্যাখো, শুধু যুদ্ধই শিখেছে। এসব সূক্ষ্ম বুদ্ধি ওদের মাথায় আসে না !"
লিভারপুলের হর্নবি তাঁর সন্তানদের বিভিন্ন আকারের ধাতুর পাত কেটে দিতেন, তাঁর পুত্রকন্যারা সেসব পাত দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করত। তিনি জার্মানদের কথা শুনে ভীষণ রেগে গেলেন।
জার্মানরা সাধারণত কাঠের খেলনা তৈরি করে, অ্যালুমিনিয়ম দিয়ে ট্রেন তৈরি করে। তাতে বয়লার থাকে, বয়লারে জল গরম হয়। ট্রেন চলতে শুরু করে। হর্নবি ধাতুর পাত দিয়ে রেললাইন, ট্রেন, ছোট-ছোট

লুকনো আছে, লিভারের বল-বাহুতে ধাক্কা লাগলে পুতুলের এক পা এগিয়ে যায়, আলম্ববিন্দু তখন ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অন্য পা'টিকে এগিয়ে দেয় । এই হল পুতুলের হাঁটার রহস্য ।
গুইলার্ড নামে আর-এক ফরাসি ভদ্রলোক পুতুলের ভেতরে ছোট্ট একটা রবার টিউব একটা বলের সঙ্গে 'বেলো এবং পাইপ' পদ্ধতিতে লাগিয়ে দেখলেন । একটা নির্দিষ্ট কম্পনে বাতাসে হাপরের মতো শব্দ হয়, পাইপ দিয়ে সেই শব্দটা বেরিয়ে আসে । দেখা গেল পুতুলের পেট টিপলে 'মামা' 'পাপা' এই দুটি শব্দ বলছে । নিউ ইয়র্কের রবার্ট ক্রে পুতুলের ভেতরে একটা চাকা লুকিয়ে রাখলেন, চাকার সঙ্গে 'লিভার' পদ্ধতিতে একটা রড পুতুলের হাতে-পায়ে লাগিয়ে দেওয়া আছে । দেখা গেল, পুতুল দিব্যি হামাগুড়ি দিতে-দিতে এগিয়ে যাচ্ছে । এই পদ্ধতিকেই একটু উন্নত করে খেলনা গাড়ির প্যাডেল আর স্টিয়ারিং একসঙ্গে যোগ করা হয় । স্টিয়ারিং ঘোরালে রাস্তা দিয়ে খেলনা গাড়ি ছুটতে থাকে । স্পেস-গানের ভেতরে ব্যাটারি থাকে, ট্রিগারে চাপ দিলেই শব্দ আর আলো বেরিয়ে আসে ।
যান্ত্রিক খেলনা নির্মাতারা ভ্যাকাসনকে একদিন বলা হয়েছিল শয়তানের অনুচর । সে দিন আর নেই ! আমরা জানি, ভ্যাকাসনের উত্তরাধিকারীরা কেউই শয়তানের অনুচর নন । তাঁরা বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক ।

রাঙা ভাঙা চাঁদকে কি কেউ গান শোনায় ? যান্ত্রিক খেলনায় তাও সম্ভব । ফরাসি পুতুল পিয়ের আশ্চর্য সব গান শোনায় ।

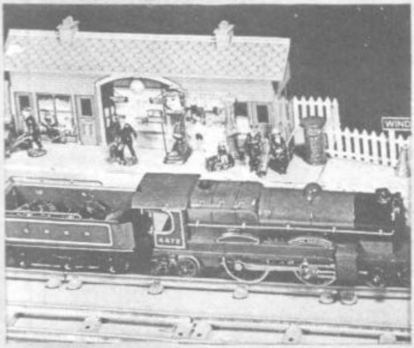

চার দেওয়ালের মধ্যে সুদূরের হাতছানি

প্ল্যাটফর্ম, স্টেশন ইত্যাদি তৈরি করলেন ।
এতদিনে ব্যাটারি আবিষ্কৃত হয়েছে, হর্নবি তাঁর ট্রেনে বয়লার রাখলেন না । ব্যাটারির সাহায্যে এই ট্রেনটি ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে । খেলনা শেষ করে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন হর্নবি । এই খেলনা থেকে ব্রিটিশ শিশুরা আধুনিক বিদ্যুৎ, ব্যাটারি এসবের ধারণা পাবে । জার্মানিরা পারবে এরকম খেলনা বানাতে ?
হর্নবি ভুল করেছিলেন !
শুধু ব্রিটিশ নয়, সারা পৃথিবীর সব দেশের সব শিশু আজও সমানভাবে তাঁর খেলনা উপভোগ করে ।

হর্নবির অনুপ্রেরণায় তৈরি ১৯০৫ সালের স্টিম ট্রেন

যে বিজ্ঞান তৈরি করেছে রিমোট কন্ট্রোল্ড ভি· সি· আর· বা কম্পিউটার, সেই বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই তৈরি হয়েছে রিমোট কন্ট্রোল্ড খেলনা । হাতে-রাখা ছোট্ট যন্ত্রের সাহায্যে এখন অন্তত এক কিলোমিটার ঘুরিয়ে আনা যায় খেলনা উড়োজাহাজ । তৈরি করেছেন কলকাতারই 'ইন্ডিয়া'জ হবি সেন্টার' ।
বিজ্ঞান যে কীভাবে আজ খেলাধুলোর জগতে ঢুকে পড়েছে তা আজ নতুনভাবে বলার প্রয়োজন নেই । সেদিন এক কিশোরকে দেখলাম । কিশোরটির দুটি চোখ বিস্ফারিত । সে রীতিমত উত্তেজিত । ঠাণ্ডা ঘরেও তার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম । হাতে তার স্টিয়ারিং । পরদায় দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে সব গাড়ি । কখনও ভাল রাস্তায়, কখনও আবার খারাপ রাস্তা দিয়ে । খারাপ রাস্তা কালো রং দিয়ে চিহ্নিত । পয়েন্ট উঠছে একটি মিটারে । কিশোরটির কাজ কোনওভাবে তার গাড়িটিকে অন্য গাড়ি ও খারাপ রাস্তার হাত থেকে বাঁচিয়ে যতটা সম্ভব নিয়ে যাওয়া । যতটা দূর সে যেতে পারবে তত পয়েন্ট পাবে । কখনও তার গাড়ি ধাক্কা খাচ্ছে অন্য গাড়ির সঙ্গে, কখনও আবার খারাপ রাস্তা

বাণ্টির খেলনা

মধ্যযুগের ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুই এবং ১৯৯০ সালের কলকাতার কিশোর বাণ্টি। এদের দু'জনের মধ্যে মিল কোথায়? না, সামান্যতম কোনও মিল

এদের দু'জনের মধ্যে আদপেই থাকা সম্ভব নয়। ফ্ল্যাট বাড়ির বাণ্টি ছবির বই ছাড়া কোনওদিন রাজসভা বা রাজপুত্র, রাজকন্যা দ্যাখেনি। তার কোনও সোনা, রুপোর তৈরি খেলনা নেই, গত বছর জন্মদিনে বাবা তাকে একটা টয়-পিস্তল কিনে দিয়েছেন। দুপুরবেলা বাণ্টি একা-একা সেই টয়-পিস্তল দিয়ে লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করে। বড় হয়ে সে আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ শিকার করতে যাবে। ফরাসি স্বর্ণকার ন্যাঙ্গির ওপর রাজপুত্র ষোড়শ লুই একবার বেশ খুশি হয়েছিলেন। ন্যাঙ্গি ফরাসি সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চান, তাঁর জন্য ছোট্ট একটি উপহারও নিয়ে এসেছেন। ভাবী সম্রাটকে ন্যাঙ্গি উপহার দিলেন সোনা ও রুপো দিয়ে তৈরি একটি সৈন্যবাহিনী, সেখানে সোনার তৈরি একটি ছোট্ট কামানও রয়েছে। কামানে চাপ দিলে দুম করে শব্দ হয়। এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এই ছোট্ট ছেলেটিকে ভবিষ্যতে অনেক যুদ্ধ করতে হবে। ভেবেচিন্তে ন্যাঙ্গি শেষ পর্যন্ত এই খেলনাটিই তৈরি করেছেন। এখন বাণ্টিদের টয়-পিস্তলের যুগ। টয়-রিভলভার বা টয়-পিস্তল জিনিসটি আমেরিকার দান। পিস্তলে ক্যাপ ফাটানো ব্যাপারটি পুরোপুরিভাবে আমেরিকান কম্পানি জে অ্যান্ড ই স্টিভেন্স-এর বুদ্ধি। স্টিভেন্স কম্পানির পিস্তলে অবশ্য সমুদ্রের সাপ, ড্রাগন এই সমস্ত খোদাই করা থাকত। আর বারুদের চেয়ে অনেক নিরাপদ হল ক্যাপ। স্টিভেন্স-পিস্তলও পুরনো হয়ে গেছে। এখন মেশিনগান, লেসারগান আর এয়ারগানের যুগ। খেলনা – মেশিনগানের ভেতরে একটা দাঁতওয়ালা চাকা থাকে, ট্রিগারে চাপ দিলে চাকা ঘুরতে শুরু করে। চাকার এক-একটা দাঁত এক-একটা দণ্ডে লাগে আর পর-পর বুম-বুম-বুম শব্দ হতে থাকে। যেসব খেলনা-পিস্তলে প্লাস্টিকের বুলেট থাকে, সেগুলি বাতাসেরচাপে চালিত হয়। ট্রিগারে চাপ দিলে ভেতরে বাতাসের চাপ সৃষ্টি হয়, প্লাস্টিকের বুলেট ছিটকে বেরিয়ে যায়। এয়ার-গানের কর্মকৌশলও ওই এক। আর, খেলনা লেসারগানের লাল কাচে ঘন-ঘন বিদ্যুতের ফুলকি সৃষ্টি হয়, মনে হয় লেসার-বিম। ওই লেসার-গান নিয়ে বাণ্টি চলে যাবে ফ্ল্যাশ গর্ডনের কাছে।

পেরোতে না পেরে হুমড়ি খাচ্ছে রাস্তার ধারে। কিন্তু কিছুতেই সে পারছে না ওই পয়েন্ট সংগ্রহ করতে, যা তাকে আর একবার ফ্রি খেলতে দেবে। অথচ তাকে ওই পয়েন্ট সংগ্রহ করতেই হবে। তাই সে আবার যায় কাউন্টারে। সংগ্রহ করে একটি টোকেন। টোকেন দেওয়া মাত্রই স্ক্রিনে ফুটে ওঠে গাড়িগুলি। এবার সে সংগ্রহ করবেই ওই পয়েন্ট।
দৃশ্যটি একটি 'ভিডিও পার্লার'-এর। কিশোরটি যে যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল আসলে তা এক খেলনা। আধুনিক জগতের সর্বাধুনিক খেলনা 'ভিডিও গেমস'। যদিও খেলনা বলতে আমরা বুঝি ছোটখাটো বা বহনযোগ্য কোনও জিনিস, এবং এইসব ভিডিও গেম সাধারণত এক-একাট

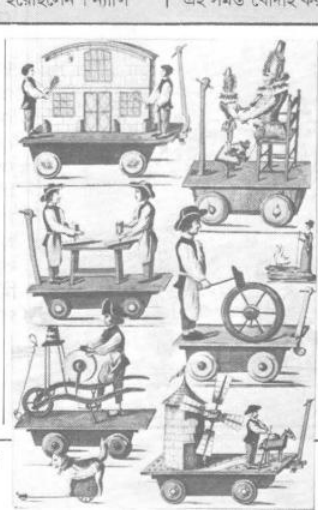

যান্ত্রিক খেলনাগুলিতে দেখা যাচ্ছে নানা পেশার মানুষদের

বিরাটকায় মেশিন, তবুও একে খেলনা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রটি আসলে একটি ইলেকট্রনিক প্রোগ্রামড খেলনা, যা কয়েন দেওয়ামাত্রই চালু হয়, ও বন্ধ হয় নির্দিষ্ট সময়ের পর। এই ধরনের ভিডিও কনসোল গেমে থাকে একেবারে নিজস্ব ইলেকট্রনিক কনসোল সিস্টেম। থাকে ইন্টারচেঞ্জেব্‌ল কার্টিজ প্রোগ্রাম ব্যবহারক্ষমতা। ইন্টারচেঞ্জেবল কার্টিজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয় খেলাগুলি। 'টেনিস', 'ব্রেক আউট', 'প্যাকম্যান', 'জাঙ্গলহান্ট' ইত্যাদি খেলা একই ভিডিও মেশিনে ইন্টারচেঞ্জেবল কার্টিজ প্রোগ্রাম বদলের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। কোনওটিতে হয় গাড়ির রেস, কোনওটিতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শিকার, কোনওটিতে দুই অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর

মধ্যে টেনিস খেলা, কোনওটিতে আবার শান্ত-শিষ্ট প্যাকম্যানকে তাড়া করে দুষ্ট চরিত্রের সব ফ্যান্টাম। প্যাকম্যান একে-একে গিলে ফেলে ফ্যান্টামদের। এই ভিডিও গেমস মেশিনে থাকে লিভার, যার ওঠা-নামার সঙ্গে শুরু হয় খেলা ও মিটার, যা পয়েন্টের সাহায্যে নির্ণয় করে খেলার ফলাফল। এইরকম শ'য়ে শ'য়ে ভিডিও গেম সারা বিশ্বে শিশুদের, এমনকী বড়দেরও আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে। আনন্দ ও উত্তেজনায় ভরা এইসব ভিডিও গেম দেশবিদেশের ভিডিও পার্লার ও আর্কেডগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলছে। বিংশ শতাব্দীর এই অত্যাধুনিক খেলনা বড়দের মনকেও ছুঁয়ে গেছে। পার্লার এবং আর্কেডগুলি ছাড়াও ভিডিও গেমসের জনপ্রিয়তা তাকে আবার অনেকের বাড়ির

পুতুলের হামাগুড়ি দেওয়ার নেপথ্যেও আছে অনেক যান্ত্রিক রহস্য

চার দেওয়ালের মধ্যেও পৌঁছে দিয়েছে। এখন আমরা ঘরে বসেই খেলতে পারি ভিডিও গেমস।

১৯৭০ সাল নাগাদ ভিডিও আর্কেডগুলিতে

রানির পুতুল

মহারাজ ও মহারানির বন্ধু! ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই ও রানি মেরি আঁতোয়ানেত। ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ ও রানি শার্লোট! স্রেফ খেলনা তৈরি করেই এই রাজা ও রানিদের বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন সুইজারল্যান্ডের পিয়েরে জ্যাকেত দ্রোজ! রাজা-রানিদের বন্ধুত্ব হয় সাধারণত অন্য কোনও দেশের রাজা বা রানির সঙ্গে। মাঝে-মাঝে বিশ্বস্ত কোনও মন্ত্রী, ধনী সওদাগর কিংবা ক্ষমতাশালী কোনও রাজপুরুষ তাঁদের বন্ধুত্বের স্পর্শ পান। জ্যাকেত দ্রোজ অবশ্য রাজা, মন্ত্রী, সওদাগর নন, তিনি অদ্ভুত সব খেলনা তৈরি করতেন। যান্ত্রিক খেলনা! অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজা-রানিরা শুধু যুদ্ধ করতেন না, খেলনার প্রতিও তাঁদের অদ্ভুত একটা আকর্ষণ ছিল। স্পেনের রাজসভার লোকেরা জ্যাকেতকে ছাড়তেই চাননি, জ্যাকেত স্পেনের রাজাকে অদ্ভুত একটা উপহার দিয়েছেন। রুপোর নস্যির কৌটোয় লাগানো রয়েছে একটা রুপোর পাখি। কৌটোর মুখ ঘোরালে পাখিটি ঠোঁট নাড়ায়। সেই রুপোর পাখি বোধ হয় গান গাইতে চায়!

জ্যাকেত দ্রোজ লোকটি স্বভাবে একটু যাযাবর ধরনের, এক রাজসভায় বেশিদিন থাকা তাঁর ধাতে নেই। স্পেন থেকে বেরিয়ে তিনি একদিন ফ্রান্সের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন! তাঁর সঙ্গে কয়েকটি মানুষপ্রমাণ পুতুল। এই পুতুলদের কারও নাম চিত্রকর, কারও নাম লেখক। নিউশাতেল শহরের শিল্প ও ইতিহাস বিষয়ক জাদুঘরে এখন এগুলি আছে। মেরি আঁতোয়ানেত নামক বালিকাটি হঠাৎ রানি হয়ে গেছেন, তিনি এখনও কেক খেতে ও পুতুল নিয়ে খেলতে ভালবাসেন। লেখককে তিনি একেবারেই কাছছাড়া করতে চান না! লেখক হাতে একটা কলম নিয়ে গম্ভীরভাবে একটি টুলের ওপর বসে থাকে। চাবি দিলে সে প্রথমে তার কলমটি একবার ডুবিয়ে নেয় দোয়াতে, তারপর কলমটি একবার ঝেড়েও নেয়। এবার লেখক দু'চোখে পিটপিট করে তাকাতে শুরু করে তারপর কলম দিয়ে কাগজে খসখস করে লিখতে শুরু করে। দুটি থেকে তিনটি বাক্য সে খুব সুন্দরভাবে লেখে, প্রতিটি বাক্যের মধ্যে বেশ দূরত্বও থাকে।
দু' তিনটি বাক্য লিখে এক সময় লেখক সত্যিই থেমে যায়, অচল হয়ে পড়ে। সে তো সত্যি লেখক নয়, শুধু এক পুতুল!
আসলে, এই পুতুল-লেখকের শরীরে একটা সিলিন্ডার ছিল, সেই সিলিন্ডারে নানাভাবে কয়েকটি চাকা ও দণ্ড ছিল লাগানো। দম দিলেই সেইসব দণ্ড স্থান পরিবর্তন করে, ফলে লেখক নানাভাবে লেখার ভঙ্গি করতে থাকে।
জ্যাকেত দ্রোজের এই পুতুল-লেখক নিশ্চয় আজকালকার অনেক খেলনা-রোবটের পূর্বসূরি হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারে।

লেখক-পুতুল

শুধু 'পিনবল মেশিন' ও 'ব্রেক আউট' ধরনের খেলাগুলি প্রচলিত ছিল। পরে ধীরে-ধীরে অন্যান্য খেলা আসতে থাকে। ১৯৭৮ সালের ১৬ জুন জাপানের টাইটো কর্পোরেশন ভিডিও গেমসের জগতে এক যুগান্তকারী খেলা আনে, যার নাম 'স্পেস ইনভেডর'। খেলাটি উত্তেজনাপূর্ণ হওয়ার দরুন দারুণ জনপ্রিয় হয়।

১৯৮০র দশক ভিডিও কনসোল গেমসের দশক বলা চলে। ফিলিপ্সের ভিডিও প্যাক, আটারির ভি সি এস ও ম্যাটেল কম্পানির ইনটেলিভিশন বর্তমানে কনসোল সিস্টেম তৈরিতে বিখ্যাত। মাইক্রো কম্পিউটার ও ভিডিও কনসোল একই সময় নাগাদ বাজারে আসে।

সর্বপ্রথম ভিডিও গেম 'পং' ১৯৭২ সাল নাগাদ আবিষ্কার করেন আমেরিকার এঞ্জিনিয়ার বুশ্‌নেল। অনেকটা ইলেকট্রনিক

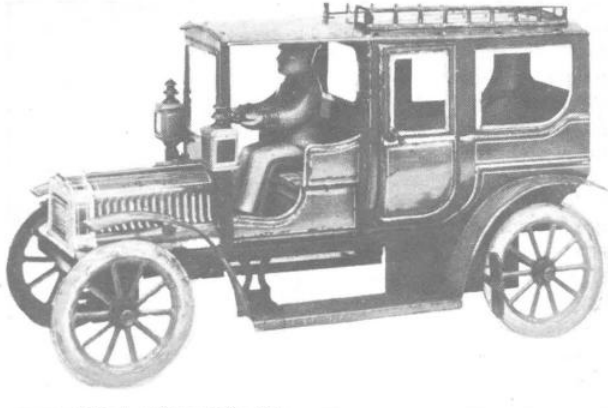

১৯১১ সালে তৈরি খেলনাগাড়ি 'ক্যারেট লিমোজিন'

রোবট ও ট্যাঙ্ক

জার্মানি তখন ভেঙে দু' টুকরো হয়ে গেছে। অনেক যুদ্ধ এবং রক্তক্ষয়ের পর্ব শেষ। পৃথিবীতে শান্তির প্রয়োজন। নিউ ইয়র্কের আকাশে পতপত করে উড়ছে রাষ্ট্রপুঞ্জের পতাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব কি শুধু এইটুকু? মহাযুদ্ধের শেষে খেলনার পৃথিবীতেও তীব্র পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বালক-বালিকারা এখন আর শুধুমাত্র খেলনা-পিস্তল বা খেলনা-বন্দুক নিয়ে তৃপ্ত নয়। তারাও ট্যাঙ্ক, হাউৎজার কামান আর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট গান ব্যবহার করতে চায়। বড়রা যদি আকাশে, মাটিতে যুদ্ধ করতে পারে, তা হলে ছোটরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? খেলনা-নির্মাতা কম্পানিগুলি তৈরি হয়েই ছিল। তারা জানে, ছোটরা সবসময় বড়দের মতো নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করতে চায়। খেলনা-টেলিফোন আর খেলনা-টাইপরাইটার নিয়ে তারা স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যায়। এবার তা হলে হবে খেলনা-যুদ্ধ। ব্রিটেন, আমেরিকা সবাই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিউ ইয়র্কের মার্ক্স কম্পানি বের করল তাদের নিজস্ব খেলনা-ট্যাঙ্ক, ব্রিটেনের উইলিয়ম অ্যান্ড সন্স অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌ট গান থেকে শুরু করে সাবমেরিন—সবকিছু নিয়ে এল ছোটদের হাতের মুঠোয়। যুদ্ধে জাপান রীতিমত পর্যুদস্ত, কিন্তু ছোটরা বড়দের রাজনীতি বোঝে না। ষাটের দশকে জাপান একটি ব্যাটারি-চালিত খেলনা জেট বিমান বাজারে নিয়ে আসে। বিমান চলতে শুরু করলেই পুতুল-পাইলট দুমদুম শব্দে বন্দুক চালাতে শুরু করে।

ষাটের দশকে কম্পিউটার জিনিসটি রীতিমত হইচই ফেলে দিয়েছে। বেসিক, ফরট্রান, ফ্লপি ডিস্ক ইত্যাদি শব্দ বড়দের মুখে-মুখে ঘুরছে। বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছেন। রোবট আবিষ্কার করতে হবে। প্রোগ্রাম করে দিলে সেই রোবট ঘর ঝাঁট দেবে, বাজারের হিসেব করবে, কারখানায় কাজ করবে।

বড়রা যদি এভাবে নিজেদের সুবিধের জন্য রোবট তৈরির চেষ্টা করেন তা হলে ছোটরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? টোকিও থেকে লন্ডন, কলকাতা থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত পৃথিবীর সব বালক-বালিকাই আজকাল রোবট নিয়ে খেলা করে। এই ভীম-ভীষণ চেহারার পুতুলগুলি হুকুম তামিল করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। চাবি দিলে হাঁটাচলা করে, তখন এদের চোখে জ্বলে লাল আলো।

খেলনার জগতে এখনও প্রোগ্রামড রোবট আসেনি, কিন্তু খুব শিগগিরই এসে যাবে। রোবট জিনিসটাই বা আদতে কী? বড়দের খেলনা? আর, বড়রা খেলনা হাতে নিলে ছোটরাই বা বাকি থাকবে কেন? ওই জগৎটা তাদের নিজস্ব।

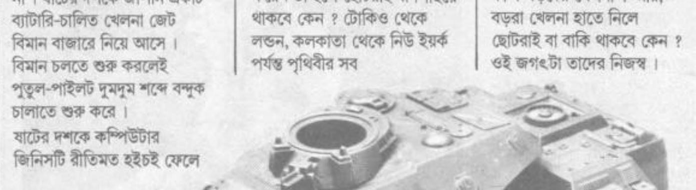

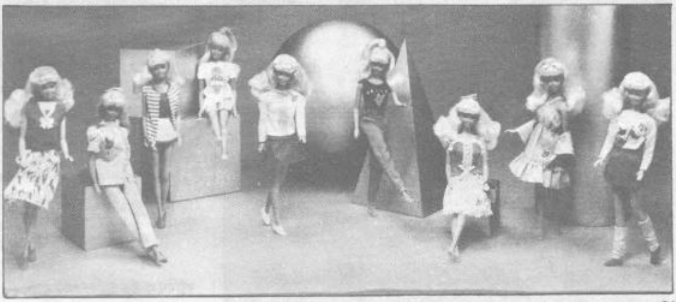

নানা সাজে বার্বি

খেলার পুতুল

প্রথম পুতুলটি যে কবে তৈরি হয় তা আমরা ঠিক জানি না। পুতুল প্রায় মানবসভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গেই চলে আসছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও শিশুরা পুতুল বানাত ও খেলত তা দিয়ে। প্রথম দিকে পুতুল তৈরি করা হত কাঠ, মাটি এবং খুব কম ক্ষেত্রে মোম ও হাতির দাঁত দিয়ে। ধাতুর তৈরি পুতুল আসে অনেক পরে। গ্রিক ও রোমানরাই প্রথম হাত-পা নাড়ানো পুতুল তৈরি করে। উনিশ শতকে কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি হত পুতুল। লণ্ডন ও নুরেনবার্গ শহরের বৈশিষ্ট্য ছিল পোর্সেলিনের পুতুল। প্যারিস বিখ্যাত ছিল পুতুলের পোশাকের

টেনিসের পোশাকে বার্বি

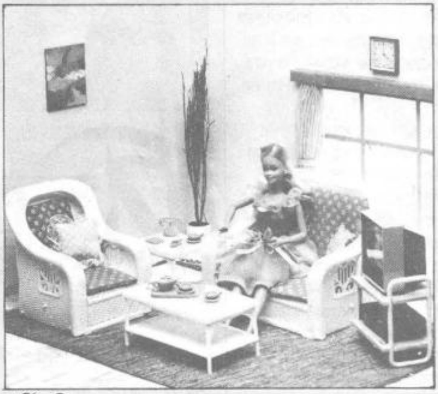

বার্বির ড্রয়িংরুম

জন্য। আগের মতোই বর্তমানেও শিশুদের কল্পনার অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে খেলনা পুতুল। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুতুলগুলি তৈরি হয় প্রধানত আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান, চিন ও ইংল্যান্ডে। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য তার লোকশিল্পের পুতুলগুলি। আজকাল তো পুতুল তৈরির নেপথ্যে অত্যাধুনিক কলাকৌশলও প্রয়োগ করা হয়। নানা ধরনের যান্ত্রিক পুতুল আছে। আর এখন তো এসে গেছে 'বার্বি' পুতুল। বার্বি নানা সাজে সাজতে পারে। কখনও সে ডাক্তার, কখনও স্টেফি গ্রাফের মতো টেনিস খেলোয়াড়, কখনও আবার জন্মদিনের সাজে সুসজ্জিতা এক কিশোরী। বার্বির রান্নাঘরে আছে রেফ্রিজারেটর ও মাইক্রোওয়েভ ওভেন। অত্যাধুনিক সাজ-সরঞ্জাম সবই তার দখলে।

খেলনা প্রস্তুতকারক কম্পানিগুলি তৈরি হয়েই ছিল। তারা জানে, ছোটরা সবসময় বড়দের মতো নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করতে চায়। ছোটরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন?

মিকিমাউস চলেছে তার বাজনাগাড়ি নিয়ে

টেনিস খেলার মতো, এই খেলার সঙ্গে বর্তমানের ভিডিও গেমের অনেক তফাত। কিন্তু তবুও বুশনেলের আবিষ্কার খুব দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু এই ভিডিও গেমগুলিই নয়, আজকের প্রতিটি খেলনার পেছনে আছে কল্পনাশক্তি, সূক্ষ্ম কারিগরি ও শিক্ষার উপাদান। আধুনিক খেলনার জগৎ এখন ধাপে-ধাপে তার শৈশব ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে কৈশোরে। বিভিন্ন ধরনের খেলনা এখন তার রং-বেরঙের চেহারা নিয়ে প্রায় প্রতিটি ঘরেই ছোটদের আনন্দ দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, খেলনা তৈরির মতো সাধারণ ব্যাপারটিতেও মাথা ঘামিয়েছেন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা।

রঙিন ফোটো : বিবেক দাস

সৌজন্য : ইন্ডিয়া'জ হবি সেন্টার, রাসেল স্ট্রিট

ইতালির পিসা শহরে ১৫৬৪ সালে গ্যালিলেও গ্যালিলি এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেই শহরেই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে লেখাপড়া করতেন। একদিন গ্যালিলেও আচমকা জ্যামিতি বিষয়ে একটি বক্তৃতা শুনে ফেলেন। এই ঘটনাটিই তাঁর জীবনের গতিপথ বদলে দেয় ও পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। চিকিৎসাশাস্ত্র ছেড়ে গ্যালিলেও এবার অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন। শুধুমাত্র দারিদ্র্যের জন্যই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেন। ইতিমধ্যে তিনি ভৌতবিজ্ঞানের সূত্রগুলির ওপর কিছু অসাধারণ তত্ত্ব ও চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেন, ফলে ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তিনি একের পর এক শিক্ষকতার চাকরি পেতে থাকেন। গল্প আছে, একদা পিসার হেলানো মিনারের ওপর থেকে দুটি বিভিন্ন ভরবিশিষ্ট বস্তু নীচে ফেলে গ্যালিলেও প্রমাণ করেন তারা একসঙ্গে মাটিতে পড়বে। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার কোনও সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই। পিসার হেলানো মিনারের ওপর নয়, কাগজের ওপরেই তিনি সূত্রটি প্রমাণ করেছিলেন।

দূরবিন চোখে গ্যালিলেও : বিজ্ঞানই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান

বিজ্ঞানে গ্যালিলেও এনেছিলেন বৈপ্লবিক চিন্তাধারা

জীবনের প্রথম দিকেই গ্যালিলেও নিশ্চিত হয়েছিলেন, দু' হাজার বছরের পুরনো টলেমির নীতিটি একেবারেই ভ্রান্ত।

জীবনের প্রথম দিকেই গ্যালিলেও নিশ্চিত হয়েছিলেন, গত ২০০০ বছরের পুরনো টলেমির নীতিটি একেবারেই ভ্রান্ত। টলেমির সূত্রটি হল, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। কিন্তু সেই মধ্যযুগে টলেমির বিপরীত ধারণা পোষণ করার অর্থ ধর্মদ্রোহিতা। সুতরাং, গ্যালিলেও এ-বিষয়ে জনসমক্ষে কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না।

১৬০৯ সালের বসন্তকালে তিনি পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছিলেন। সেই সময়ে তিনি শুনতে পান, হল্যাণ্ডে একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যার নাম টেলিস্কোপ। গ্যালিলেও একদিনের মধ্যে যন্ত্রটিকে ঢেলে সাজালেন, আরও উন্নত করে তুললেন। এবার সেই যন্ত্র দিয়ে তিনি আকাশ পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন, পৃথিবীতে প্রথম অনেক নতুন জিনিস দেখতে পেলেন। শনিগ্রহের বলয়গুলিও প্রথম সুস্পষ্টভাবে তাঁর চোখেই ধরা পড়ল। সূর্যের চারপাশে কয়েকটি বিন্দুর আবর্তন দেখে গ্যালিলেও নিশ্চিত হলেন কোপার্নিকাসের তত্ত্বই সঠিক। পৃথিবী আদৌ সৌরজগতের কেন্দ্র নয়, এ-কথা এখন জানাবার সময় এসে গেছে। বহুবার তিনি রোমে গেলেন, শেষ পর্যন্ত ১৬২৪ সালে পোপের কাছ থেকে অনুমতিও পেলেন। 'জগতের অবস্থা' বিষয়ে গ্যালিলেও এখন কোপার্নিকাস ও টলেমি দু'জনের তত্ত্বই আলোচনা করতে পারবেন। ১৬৩২ সালে তাঁর 'ডায়লগ কনসার্নিং দ্য টু চিফ ওয়ার্ল্ড সিস্টেমস' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত ইউরোপে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ বলে স্বীকৃত হল। কিন্তু গ্যালিলেওকে এর মূল্য দিতে হল ভীষণভাবে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ তখনও প্রোটেস্টান্ট সংস্কারের আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ধর্মযাজকরা ঘোষণা করলেন, "লুথার এবং ক্যালভিনের সমষ্টিগত অপরাধের চেয়েও গ্যালিলেওর একার অপরাধ ধর্মের পক্ষে আরও বেশি ক্ষতিকারক।" রোম শহরে একটি জাল দলিল পাওয়া গেল, এই দলিলে নাকি বলা হয়েছে গ্যালিলেও যেন কোনওভাবেই কোপার্নিকাসের তত্ত্ব আলোচনা না করেন।

গ্যালিলেওকে গ্রেফতার করে অভিযুক্ত করা হল, তাঁকে দেখানো হল শারীরিক অত্যাচারের ভয়ও। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল, ফ্লোরেন্সে তাঁর নিজের বাড়িতে তাঁকে অন্তরীণ অবস্থায় বাকি জীবন কাটাতে হবে। এত কিছু সত্ত্বেও গ্যালিলেও দমলেন না, তিনি একের পর এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন সেগুলি লিখে রাখলেন। শেষ করলেন তাঁর বই ডায়লগ কনসার্নিং দ্য টু নিউ সায়েন্সেস। এই বইয়ে গ্যালিলেও পদার্থবিজ্ঞান ও বলবিদ্যা নিয়ে তাঁর যাবতীয় চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৬৩৮ সালে, প্রোটেস্টান্টরা নেদারল্যাণ্ডস থেকে এই বইটি প্রকাশ করেন। এর চার বছর পর, ৭৮ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে অন্তরীণ অবস্থাতেই গ্যালিলেওর মৃত্যু হয়। কিন্তু ততদিনে তিনি জেনে গেছেন, "এই বিশ্ব, এই জগৎ, এই পৃথিবী আর আগের অবস্থায় নেই। প্রাচীন যুগের পণ্ডিতদের বিশ্বাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই পৃথিবী এগিয়ে গেছে আরও অনেক...অনেক দূরে।"

নিল ও'ব্রায়েন

প্রশ্ন

(১) এ-বছর দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার কে পেয়েছেন ? **বেবি, কবিতা ও রঞ্জন ব্রহ্ম**, সালকিয়া, হাওড়া।
(২) ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর নাম কী ? **গৌতম পুরকায়স্থ**, কলকাতা-১২।
(৩) বিশ্বের প্রাচীনতম বিমানবন্দর কোনটি ? **মানবেন্দ্রনাথ ঘোষ**, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি।
(৪) ডাকটিকিট কে কোথায় প্রচলন করেন ? **জয়ন্ত বিশ্বাস**, ভানোড়া কোলিয়ারি।
(৫) 'কাম সেপ্টেম্বর' ছবিটির নায়িকা কে ? **জয় বসাক**, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।
(৬) পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম এবং সবচেয়ে হালকা পেসমেকারটির নাম কী ? **গৌতম পুরকায়স্থ**, কলকাতা-১২।
(৭) স্বাধীন নামিবিয়ার প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট স্যাম নুজোমাকে শপথবাক্য পাঠ করান কে ? **ছবি দত্ত**, কল্যাণী, নদীয়া।
(৮) পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদটির নাম কী ? **রণজয় শর্মা**, ব্রিকফিল্ড রোড, বর্ধমান।
(৯) ভারতের বর্তমান যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যানের নাম কী ? **সৈয়দ ফারহানা**, রাজগ্রাম জুনিয়ার গার্লস হাই স্কুল, রাজগ্রাম, বীরভূম।
(১০) কে প্রথম অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের চারপাশে জাহাজ চালিয়ে ঘুরে আসতে পেরেছিলেন ? **সায়ন্তনী দাস**, কলকাতা-৬০।
(১১) এক বিখ্যাত লেখকের ছদ্মনাম 'পরশুরাম'। তাঁর নাম কী ? **অলোক কয়াল**, শিলিগুড়ি।
(১২) টেস্ট ক্রিকেটে ইমরান খান প্রথম কাকে আউট করেছিলেন ? **পিনাকী মুখার্জি**, বেহালা, কলকাতা-৩৪।
(১৩) 'হীরক রাজার দেশে' ছবির সঙ্গীত-পরিচালক কে ? **পাপু, রিয়া ও ঋভু সেন**, আমোদপুর, বীরভূম।
(১৪) এক বিখ্যাত ক্রিকেটারকে 'জেড' নামে ডাকা হত ? তাঁর নাম কী ? **সঞ্চিতকুমার পাঁজা**, পাল্লা রোড, বর্ধমান।
(১৫) রাশিয়ার শেষ রাজবংশের নাম কী ? **সায়ন চক্রবর্তী**, হরিনাভি।
(১৬) ভারতের বর্তমান প্রধান বিচারপতি কে ? **বিক্রমজিৎ চক্রবর্তী**, রবীন্দ্রনগর, মেদিনীপুর-১।
(১৭) অক্সিজেন ছাড়াও বাঁচতে পারে এমন একটি প্রাণীর নাম কী ? **রাজশ্রী দাস**, রামচন্দ্রপুর, হাওড়া।
(১৮) স্টেফি গ্রাফ কত সালে কোন তারিখে জন্মেছিলেন ? **কমল সিওয়া**, হ্যামিল্টনগঞ্জ, জলপাইগুড়ি।
(১৯) ভারতের কোন রাষ্ট্রপতি সর্বপ্রথম পর্তুগাল সফর করেন, এবং কত সালে ? **বিক্রমজিৎ চক্রবর্তী**, রবীন্দ্রনগর, মেদিনীপুর।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) স্টেফি গ্রাফ।
(২) গুরু নানকের জন্মস্থান।
(৩) অল ইংল্যান্ড লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশন।
(৪) ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ।
(৫) জাপানের।
(৬) চিনের প্রাচীর।
(৭) অখিল নিয়োগী।
(৮) ক্যামেরুন ও মিশর।
(৯) রিতা ফারিয়া, ১৯৬৬ সালে।
(১০) মলগাস।
(১১) 'দ্য গ্র্যাজুয়েট'।
(১২) ২১ মার্চ, ১৯৯০। স্যাম নুজোমা।
(১৩) আমেরিকার জিমি কোনর্স।
(১৪) ইয়ান বথাম।
(১৫) আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলিস, ক্যালিফোর্নিয়া।
(১৬) ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
(১৭) স্কটল্যান্ড।
(১৮) গ্যারি লিনেকারকে।
(১৯) চিনের সাংহাই-এ।
(২০) ওড়িশার বালিয়াপোল।
(২১) ইন্দ্রকুমার গুজরাল।

জিমি কোনর্স

ইয়ান বথাম

গুরু নানক

গ্যারি লিনেকার

বিষয় : গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়

প্রশ্ন :

(১) কলকাতার বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগারের মাঠে কোন বিখ্যাত গভর্নর-জেনারেল দ্বৈতযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ?

(২) ভারতবর্ষে অপরাধ ও স্বেচ্ছাচারের অভিযোগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কোন গভর্নর জেনারেলের বিচার হয়েছিল ?

(৩) কোন গভর্নর জেনারেল ভারতে 'সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষার প্রচলন করেছিলেন ?

লর্ড মেয়ো

(৪) কোন ঘটনার পর লর্ড কর্নওয়ালিস আনন্দে বলে উঠেছিলেন, "আমাদের বন্ধুদের কোনও ক্ষতি হয়নি, কিন্তু শত্রুকে আমরা এবার সত্যিই পঙ্গু করে দিয়েছি ?"

(৫) কোন গভর্নর জেনারেল কলকাতার রাজভবন তৈরি করেছিলেন ?

(৬) এক গভর্নর জেনারেল দ্বিতীয়বার ভারতশাসনের দায়িত্ব পেয়ে ভারতে পৌঁছন এবং তার কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংস

(খ)

(ক)

(গ)

(ঘ)

প্রশ্ন

(ক) ইনি বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেছিলেন। এঁর নাম বলো।

(খ) সতীদাহ নিবারণের জন্য ইনি আইন জারি করেছিলেন। এঁর নাম কী ?

(গ) ভারতের প্রথম ভাইসরয়। নাম কী এঁর ?

(ঘ) ইনি বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ইন্ডিয়ার চারবার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। এঁর নাম কী ?

ছবির পরিচয় : (ক) লর্ড জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন। (খ) লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। (গ) লর্ড চার্লস জন ক্যানিং। (ঘ) আর্ল অব অ্যালেনবরো।

ওই গভর্নর জেনারেলের নাম কী ?

(৭) কোন গভর্নর জেনারেল রণজিৎ সিংহকে অমৃতসরে 'চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব' নামে অনাক্রমণ-চুক্তি সই করতে বাধ্য করেন ?

(৮) কোন গভর্নর জেনারেল সিন্ধুপ্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন ?

(৯) কোন গভর্নর জেনারেল ঠগি-দমন করেছিলেন ?

(১০) কোন গভর্নর জেনারেল সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেন ?

(১১) লর্ড ডালহৌসি 'স্বত্ববিলোপ নীতি' প্রচলন করেছিলেন। এই নীতিটি কী ?

(১২) ভারতে কে প্রথম রেললাইন প্রবর্তন করেন ?

(১৩) কোন গভর্নর জেনারেলের ডাকনাম দেওয়া হয়েছিল 'ক্ষমাশীল' (clemency) ?

(১৪) কোন ভাইসরয় নিহত হয়েছিলেন ?

(১৫) কে প্রথম ভারতে লোকগণনা চালু করেন ?

(১৬) কোন ভাইসরয় ১৮৭৭ সালে এক জমকালো দরবারে মহারানি ভিক্টোরিয়াকে 'ভারতের সম্রাজ্ঞী'

লর্ড লিটন

বলে অভিহিত করেছিলেন ?

(১৭) 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'-এর ফলে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কোনও সংবাদ প্রকাশ করার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়। এই কুখ্যাত আইনটি কে প্রচলন করেছিলেন ?

(১৮) ওই ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট কে রদ করেছিলেন ?

উত্তর : (১) ওয়ারেন হেস্টিংস ফিলিপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। (২) ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনিই একমাত্র গভর্নর জেনারেল, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যাঁর বিচার হয়েছিল। (৩) লর্ড কর্নওয়ালিস। (৪) শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে ব্রিটিশরা টিপু সুলতানকে পরাজিত করে টিপুর রাজ্যের কিছু অংশ মারাঠাদের এবং নিজামকে উপহার দেয়। সেই ঘটনার পরেই কর্নওয়ালিসের এই দম্ভোক্তি। (৫) লর্ড ওয়েলেসলি। (৬) লর্ড কর্নওয়ালিস। (৭) লর্ড মিন্টো। (৮) লর্ড অ্যালেনবরো। (৯) উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। (১০) উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। (১১) কোনও ভারতীয় রাজার যদি প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকে, তাঁর দত্তকপুত্র কখনওই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃত হবেন না। রাজ্যটি ব্রিটিশদের হাতে চলে আসবে। (১২) লর্ড ডালহৌসি। (১৩) লর্ড ক্যানিং। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর তিনি বিদ্রোহীদের ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। (১৪) লর্ড মেয়ো। (১৫) লর্ড মেয়ো। (১৬) লর্ড লিটন। (১৭) লর্ড লিটন। (১৮) লর্ড রিপন।

খেলার গল্প

নদুক্ষেপ

রূপক সাহা

রেড রোডের মাঝামাঝি এসে গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। আর তারপরই ড্রাইভার বাঁকেলাল আঁতকে উঠে বলল, "সর্বনাশ, পেট্রল শেষ।"

বিরক্তি চেপে রেখে বললাম, "এখন কী হবে ? গাড়ি নিয়ে বেরোবার সময় একবার দেখে নিতে পারলে না, পেট্রল আছে কী নেই ?"

দরজা খুলে বেরোতে-বেরোতে বাঁকেলাল বলল, "দেখে নিলেই ভাল হত। অফিস গিয়ে পেট্রল নিয়ে আসা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।"

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, রাত তিনটে। নাইট ডিউটি করে বাড়ি ফিরছি। যাব বেহালা। তার মাঝে এই বিপত্তি। বাঁকেলাল অফিস ফিরে যেতে চাইছে। প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ। হেঁটে গিয়ে ফিরে আসতে-আসতে লাগবে প্রায় আধ ঘণ্টা। গাড়িতে আরোহী বলতে শুধু আমি ! বাঁকেলালের অফিসে যাওয়ার অর্থ, গড়ের মাঠে এই নির্জন রাস্তায় গাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য একা আমাকেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বিশ্রী ব্যাপার। ময়দানের এই অঞ্চলটা সুবিধের নয়। ছিনতাইবাজরা তো আছেই, তার ওপর ট্যাক্সি-ভূত আর স্টোনম্যানের ভয়। একমাত্র আশা, কোনও গাড়িতে যদি অফিস পর্যন্ত লিফট পাওয়া যায়। এত রাতে কোনও গাড়ির দেখা মেলাও ভাগ্যের ব্যাপার।

কী করব ভাবছি, হঠাৎ ফোর্ট উইলিয়ামের আইল্যান্ড থেকে দুটো জোরালো হেড লাইট এগিয়ে এল। মনে হল, পুলিশের গাড়ি। বাঁকেলাল চট করে রাস্তা পেরিয়ে ওদিকে চলে গেল। তারপর হাত নাড়িয়ে ভ্যানটাকে থামালও। উলটো দিক থেকে টুকরো-টুকরো কথা কানে আসছিল। এঞ্জিনের শব্দে ভাল করে তা শুনতে পাচ্ছিলাম না। সত্যি বলতে কি, বাঁকেলালের ওপর আমার তখন বেশ রাগই হচ্ছিল। এমন বিপদে ফেলার কোনও মানে হয় ! সকাল হতে ঘণ্টা আড়াই দেরি। অফিসেই ফিরে যাব কি না তখন ভাবছি।

রাস্তার এদিক থেকে আমি কিছু বলার আগেই, ওদিক থেকে চিৎকার করে বাঁকেলাল বলল, "অফিসে যাচ্ছি। মিনিট পনেরো গাড়ির ভিতর থাকুন। দরজাটা কিন্তু লক করে দেবেন।"

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পুলিশের গাড়িটা মিলিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই টের পেলাম, রেড রোডটা কত বড়। সকাল-বিকেল কতবার এই

রাস্তাটার ওপর দিয়ে গেছি। এর মসৃণতা নিয়ে মনে-মনে প্রশংসাও করেছি। কলকাতায় এত সুন্দর রাস্তা আর কোথাও নেই। দু'পাশে হলুদ রঙের রেলিং। বাহারি গাছ, স্ট্যাচু। ভিক্টোরিয়ার বাগান বাদে ময়দানের সবথেকে ভাল জায়গা এটা।

কিন্তু ওই গভীর রাতে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে আমার বেশ ভয়-ভয়ই করতে লাগল। এত সোজা আর ঘন কালো, মনে হল গিলে খেতে আসছে। গাড়ির ভিতর বসে থাকাই ভাল, এই কথা ভেবে দরজার হাতলে যেই হাত দিয়েছি, এমন সময় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটায় চোখ গেল। হালকা সবুজ আর নীল আলোয় ওই জায়গাটা যেন ছেয়ে আছে। চাঁদের আলোর মতো মোলায়েম নয়। একটু অন্য ধরনের। এত রাতে, ইস্টবেঙ্গল মাঠ আর ফোর্ট উইলিয়ামের মাঝে ওইরকম একটা রহস্যময় আলো দেখে, সত্যি বলতে কী একটু অবাকই হলাম।

গা-ছমছম করে উঠল। দরজাটা খুলতে যাব, ঠিক সেই সময় শুনলাম মিহি গলায় একজন অন্যজনকে বলছেন, "নদুবাবু এই লোকটার কথাই বলেছিল। ময়দানে রোজ দেখি। খবরের কাগজে লেখে।"

চমকে উঠে দেখি, আশপাশে কেউ নেই। তবে কি আমার মনের ভুল ? হতে পারে। হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে। গাড়ির ভেতরে ব্যাগে মাফলার রাখা ছিল। বের করে গলায় জড়িয়ে নিলাম। মনে-মনে ঠিক করলাম, নাউট ডিউটি থাকলে এর পর থেকে আর বাড়ি ফিরছি না। দু-তিনটে ঘন্টার তো ব্যাপার। অফিসেই কাটিয়ে দেব।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মিনিট দুয়েকও কাটেনি। বাঁকেলালের ফিরতে অনেক দেরি। নির্জনতা অনেক সময় মানুষকে দুর্বল করে দেয়। আমিও কেমন যেন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে লাগলাম। বাঁ দিকে বি এন আর ক্লাবের তাঁবু। লনে কয়েকটা চেয়ারও রয়েছে। সন্ধেবেলায় ওখানে জমাটি আড্ডা বসে। বলরাম, অরুণ ঘোষ—আরও অনেকে আসেন। ইন্টারভিউ নিতে বেশ কয়েকবার ওই আড্ডায় আমিও গেছি। একবার মনে হল, পাঁচিল টপকে ওই তাঁবুতে চলে যাই। দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে অন্তত নিরাপদ। কিন্তু মালিরা আমাকে চেনে না। এত রাতে একজন অজানা লোকের জন্য ওরা ঘুম ছেড়ে উঠবেই বা কেন ?

এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় ঝুপ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। রেড রোডের সব আলো একসঙ্গে নিভে গেল। আর সেই ঘন অন্ধকারের মাঝে টের পেলাম, খুব কাছেই কারা যেন দাঁড়িয়ে আছেন। গা-টা শিরশির করে উঠল। গাড়ির পিছনের দরজার হ্যান্ডেলটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। কানের কাছে একজন ফিসফিস করে বললেন, "আপনি কি রিপোর্টার ?"

আতঙ্কে গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোল না। বুকে প্রচণ্ড ধুকপুকুনি, পা দুটো অবশ। আবার ফিসফিসানি, "অনেকক্ষণ আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। নদুবাবু আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।" কথা শেষ হতে-না-হতেই কে একজন আমার মাথায় বড়সড় হেড ফোন জাতীয় একটা জিনিস বসিয়ে দিল।

তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই।

আবার চোখ খুলেই দেখি, অন্য পরিবেশ। সামনে একটা ফুটবল মাঠ। চারপাশে কয়েক ধাপ কাঠের গ্যালারি। তিলধারণের স্থান নেই। ফিকে নীল আর সবুজ আলোয় রহস্যময় পরিবেশ। মাথার ওপর মেঘহীন আকাশ। তারাগুলো ঝকমক করছে। পুব দিকে, বেশ দূরে একটা গম্বুজ। আবছা আলো সত্ত্বেও যেন মনে হল, অক্টারলোনি মনুমেন্ট। কোথায় বসে আছি, আন্দাজ করতে লাগলাম। ময়দানে খুব চেনা জায়গায়, অথচ অচেনা। পুব দিকের গ্যালারির পিছনে রাস্তায় গ্যাস বাতি। টিমটিম করে জ্বলছে। রেড রোড ? হতে পারে। দু-একবার শেয়ালের ডাকও শুনতে পেলাম। পশ্চিম দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক গায়ে লাগল।

ওই রহস্য-মাখানো পরিবেশে বসে থাকতে-থাকতে ইন্দ্রিয়গুলিকে একটু সজাগ করছি। গ্যালারিতে এত লোক, অথচ কোনও শব্দ নেই। হয় আমি কাচের বদ্ধ ঘরে বসে আছি, না হয় তো কেউ জাদুবলে সাউণ্ড সিস্টেম অকেজো করে রেখেছে। গ্যালারিতে সামান্য অস্থিরতাও লক্ষ করছি। কোনও ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে যেমনটি হয়, সেইরকম। দর্শকরা সাগ্রহে কিছু একটা দেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। ...কারও মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। অথচ তাঁরা যে উপস্থিত আছেন, তা বুঝতে পারছি। মনে হল, আমি কি তা হলে স্বপ্নের ঘোরে রয়েছি ?

ঠিক এই সময় মিহি গলায় একজন বললেন, "নমস্কার, আপনি আসায় আমরা অত্যন্ত খুশি। আমিই নদু মিত্তির। মোহনবাগান ক্লাবে আছি।"

চমকে উঠে বাঁ পাশে তাকিয়ে দেখি, ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক বসে আছেন। মোটাসোটা চেহারা। আতরের সৌরভ ছড়িয়ে কখন যেন হাজির হয়েছেন। আঙুলে সাত-আটটা মূল্যবান আংটিও চোখে পড়ল। কে এই নদুবাবু ?

আমাকে চমকে উঠতে দেখে ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। মনে হল, মজাও পেয়েছেন। বললেন, "অবাক হবেন না। বিশেষ উদ্দেশ্যেই আজ আমরা আপনাকে নিয়ে এসেছি। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে আপনি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'বাষট্টির জাকর্তা এশিয়ান গেমসে আমাদের টিমই, ভারতের সর্বকালের সেরা ফুটবল টিম।' এই মন্তব্যটাতে আমরা খুবই বিচলিত হয়ে উঠেছি।"

মিটিমিটি হাসছেন নদুবাবু। বললেন, "ব্রিটিশ যুগের কিছু টিমের খেলা দেখার সৌভাগ্য আপনাদের হয়নি। সেজন্যই বোধ হয় ওই মন্তব্যটা করেছেন। বাষট্টির চুনী-বলরাম-পি· কে'র দলটাকে যখন-তখন তিন-চার গোলে হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত ব্রিটিশ যুগের দু-তিনটি দল। দুর্ভাগ্য, ওঁরা তেমন প্রচার সে-সময় পাননি।"

হাঁ করে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনি বলছেন কী ! আস্তে-আস্তে যেন বাস্তবে ফিরে আসছি। ফুটবল আমার খুবই প্রিয় বিষয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করতে ভালবাসি। স্বাধীনতার আগের যুগ আর পরের যুগের ফুটবল নিয়ে এই সন্ধেবেলাতেও কয়েকজনের সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডা করেছি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় দলগুলি এলেবেলে ফুটবল খেলত।। না ছিল কোনও কোচ, না ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। নদুবাবু না কে, এই লোকটা ফালতু কথা বললে মানব কেন ?

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই নদুবাবু শুরু করলেন, "কলকাতার ফুটবলের

সঙ্গে বহুদিন জড়িয়ে আছি। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ টিম—আমরাই তা বলতে পারি। আমাদের মতে, উনিশশো এগারোর শিল্ড-জয়ী মোহনবাগান টিম অথবা তিরিশ দশকের শেষ দিকের মহমেডান টিম—ভারতের সর্বকালের সেরা।"

আর চুপ করে থাকা যায় না। বলে ফেললাম, "বাহাত্তরের ইস্টবেঙ্গল টিম আর আটাত্তরের মোহনবাগান তা হলে কিছুই না ?"

নদুবাবু কিন্তু এ-কথা শুনে একটুও উত্তেজিত হলেন না। বললেন, "আমার তো মনে হয় কিছুই না। এই দুটো টিম কমপক্ষে চার গোল করে খেত। যদি এগারোর শিল্ড-জয়ী মোহনবাগান অথবা তিরিশের দশকের মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে খেলত। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি। ওই ম্যাচ যদি নিজের চোখে দেখতে চান, তা হলে সে-ব্যবস্থাও করতে পারি।"

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোক একটু অদ্ভুত ধরনের বটে, কিন্তু যা বলছেন, এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন যে, থামিয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না। নদুবাবু আরও বললেন, "আজ আপনাকে এখানে আনার উদ্দেশ্যটা তা হলে বলেই ফেলি। শিল্ড-জয়ী মোহনবাগানের সেই দলটার সঙ্গে আজ আমরা আটত্রিশের লিগ-জয়ী মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ম্যাচ খেলাচ্ছি। এই খেলাতেই ঠিক হয়ে যাবে—ভারতের সর্বকালের সেরা কোন টিম ?"

শুনে আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক বলছেনটা কী ! উনিশশো এগারো সালের টিমের সঙ্গে আটত্রিশ সালের একটা টিমের ম্যাচ ? কীভাবে সম্ভব ? কোনও সন্দেহ নেই, দুটো দলই দুর্দান্ত। মোহনবাগান প্রথম শিল্ড জিতেছিল ব্রিটিশ টিমদের হারিয়ে। সেকালে যা ভাবাই যেত না। ভারতের খেলার ইতিহাসে ওই জয় একটা বিরাট মাইল-স্টোন। অন্যদিকে চৌত্রিশ থেকে আটত্রিশ—এই পাঁচ বছর টানা কলকাতার লিগ-চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল মহমেডান দল। সে-সময় এই সাফল্য কোনও ব্রিটিশ দলেরও ছিল না। মহমেডানের এই কৃতিত্ব ছাপিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। সত্তর দশকে। অর্থাৎ কিনা তিরিশটা বছর মহমেডানের রেকর্ড অটুট ছিল।

তা নয় হল। কিন্তু নদুবাবুর এই ম্যাচ কী করে সম্ভব ! মোহনবাগানের শিল্ড-জয়ী টিমে এমন অন্তত পাঁচজন প্লেয়ার ছিলেন, যাঁদের বয়স তিরিশের বেশি। সাতাশ বছর পর—আটত্রিশে, তাঁদের বয়স ষাটের কাছাকাছি। কী করে তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষা দেবেন মহমেডানের যুবকদের সঙ্গে !

নদুবাবু বোধ হয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পারলেন। তাই বললেন, "দুই টিমের প্লেয়ারদের বয়সের কথা ভাবছেন বুঝি। ভাবনাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে এখন অনেক কিছুই সম্ভব। এই তো কিছুদিন আগে, ব্রাজিলে এমন একটা ম্যাচ হয়ে গেছে। ওদের বাষট্টির জুলে রিমে কাপ-জয়ী টিমের সঙ্গে সত্তরের টিমের। পেলে দুটো টিমের হয়েই খেললেন।

এক-একটা হাফে। খেলাটা শেষ পর্যন্ত ১—১, ড্র থেকে গেল। একটা গোল পেলে-র। অন্যটা গ্যারিঞ্চার। এইরকম ম্যাচ বা লড়াই সারা বিশ্বে এখন আকছার হচ্ছে।"

আমার চোখে-মুখে অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখে নদুবাবু ফের বলতে শুরু করলেন, "এই তো সেদিন ফিলাডেলফিয়ায় হয়ে গেল হেভিওয়েট জো লুই আর মহম্মদ আলির লড়াই। সারা আমেরিকা জুড়ে সে কী হইচই। বারো রাউণ্ড লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কিন্তু জিতলেন জো লুই। ওদের ফিরতি লড়াই আগামী শুক্রবার।"

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের টানাপোড়েনে তখনও আমি দুলছি। নদুবাবু যা বলছেন, তা কি সত্যি ? সারা বিশ্বে এতসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তার কিছুই জানি না ! নদু মিত্তির বোধ হয় এবারও আমার মনের কথা পড়ে ফেললেন। তারপর বললেন, "শুনতে যতই অবাস্তব মনে হোক, যা বলছি তা ঘটনা। মস্কোতে এই মুহূর্তে একটা দাবা ম্যাচ চলছে, যা কয়েক দশকের একটা বিতর্ককে থামিয়ে দেবে। বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবাড়ু কে, এই প্রশ্নেরও মীমাংসা করে দেবে। হ্যাঁ, আমেরিকার ববি ফিশার আর রাশিয়ার গ্যারি কাসপারভের কথাই বলছি। কিছুদিন আগে কাসপারভ রেটিংয়ে ছাপিয়ে গেছেন ফিশারকে। আর তারপরই এই ম্যাচের ব্যবস্থা। পনেরো রাউণ্ডের খেলা। সাত রাউণ্ড হয়ে গেছে। ফিশার ৪-৩ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। এই খবরটা তো আপনার জানা উচিত।"

নদুবাবুর এই কথাটায় খুব লজ্জা পেয়ে গেলাম। আমতা-আমতা করে বললাম, "আপনি যা বলছেন, তা খুবই ইন্টারেস্টিং। তবে, দু' যুগের দুই খেলোয়াড়কে নিয়ে এই ধরনের খেলা কীভাবে সম্ভব ? ধরুন, ডন ব্রাডম্যান আর সুনীল গাওস্কর—কে সেরা, সেটা বিচার করবেন কী করে ?"

নদুবাবু হাসলেন। আত্মবিশ্বাসের হাসি। অর্থাৎ কিনা, এতক্ষণ যা বোঝাতে চাইছেন, শেষ পর্যন্ত আমার মাথায় তা ঢোকাতে পেরেছেন। বললেন, "আপনাকে তো প্রথমেই বলেছি, বিজ্ঞানের যুগে অনেক কিছুই সম্ভব। টাইম মেশিনের কথা কখনও শুনেছেন ? টাইম মেশিনের দ্বারা এখন সব কিছুই সম্ভব। কথাটা হয়তো একটু বাড়িয়েই বললাম। টাইম মেশিন দিয়ে এখন অনেক কিছুই সম্ভব। সারা বিশ্বে গত একশো বছরে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাই এখন ইচ্ছে করলে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। বিজ্ঞানীরা এই মেশিন আরও উন্নত করেছেন। এখন তো এক যুগের ঘটনার সঙ্গে অন্য যুগের ঘটনাবলীর তুলনাও করতে পারছেন। তবে কিনা, সেই একশো বছরের মধ্যেই। এখন যদি আপনি প্রশ্ন তোলেন, পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট জিততে পারতেন কি না, টাইম মেশিনের এখনও পর্যন্ত যা পাল্লা, তাতে বলা সম্ভব হবে না। কিন্তু যা দিন আসছে—ভবিষ্যতে একদিন তা সম্ভব হলেও হতে পারে। সেসব কথা থাক, আজকের কথা বলি। নিজের চোখেই আজ একটা ম্যাচ প্রত্যক্ষ করে যান। আমাদের মতে, ভারতের সেরা দুটো টিমের। তারপর আপনি নিজেই না হয় সিদ্ধান্ত নেবেন, ভারতের সর্বকালের সেরা টিম কোনটি ?"

মাঠের দিকে তাকালেন নদুবাবু। তারপর বললেন, "ফেন্সিংয়ের ধারে ওই যে সোফাটা দেখছেন, তাতে খাতা-কলম নিয়ে বসে আছেন তিন প্রাক্তন ফুটবলার। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ টিমের নর্মান প্রিচার্ড, মোহনবাগান ক্লাবের গোষ্ঠ পাল এবং ই বি আর টিমের সামাদ। নিশ্চয়ই জানেন, এই

তিনজন অতীতের দিকপাল খেলোয়াড়। তবে তুলনায় নর্মান প্রিচার্ড একটু কম পরিচিত। কেননা, উনি এই শতাব্দীরই খেলোয়াড় নন। কলকাতার ফুটবলে এই প্রিচার্ডই প্রথম হ্যাটট্রিক করেন। শুধু ফুটবলার হিসেবেই নন, অ্যাথলেটিকসেও তিনি দক্ষ ছিলেন। উনিশশো সালে প্যারিস ওলিম্পিক থেকে প্রিচার্ড দুটো ব্যক্তিগত পদক জিতে এনেছিলেন। এশীয় হিসেবে তিনিই প্রথম পান ওলিম্পিক পদক।"

একটু থেমে নদুবাবু আবার বললেন, "প্রিচার্ডের ডান পাশেই বসে আছেন গোষ্ঠ পাল। ইংরেজরা যাঁর নাম দিয়েছিলেন 'চাইনিজ ওয়াল'। খুব বেশি পরিচয় দেওয়ারও বোধ হয় দরকার নেই। গোষ্ঠ পালের পাশে আছেন সামাদ। বল নিয়ে এমন ভেলকি দেখাতেন যে, সবাই তাঁকে বলতেন জাদুকর সামাদ। এই তিন শ্রেষ্ঠ ফুটবলারকে আমরা আজ খেলার পর সংবর্ধনা দিচ্ছি। এঁরা আবার আজকের ম্যাচের বিচারকও।"

এই নদুবাবুকে একটু গণ্ডগোলে-মার্কা লোক বলে মনে হচ্ছিল। একে তো, যে ম্যাচ দেখাবেন বলছেন, সেটাই অবাস্তব। তার ওপর আবার সাইড লাইনে বিচারক বসিয়ে রেখেছেন! ফুটবল মাঠে তো রেফারিই বিচারক। ভদ্রলোক আমাকে ভেবেছেনটা কী? আরও আশ্চর্য, দেখা হওয়ার পর থেকে আমি মনে-মনে যা কিছু ভাবছি, ভদ্রলোক যেন সব কিছু টের পেয়ে যাচ্ছেন। মুখ ফুটে কিছু বলার আগেই ঝটপট তার উত্তর দিচ্ছেন। নদুবাবু কি অন্তর্যামী? এ-কথাটিও বোধ হয় বুঝে ফেললেন নদুবাবু। মিটিমিটি হেসে বললেন, "আপনি যে-ধরনের ম্যাচের কথা ভাবছেন, মোটেই এটা সে-ধরনের হচ্ছে না। ফুটবল-বিজ্ঞান এখন এমন এগিয়েছে, শব-ব্যবচ্ছেদের মতো একটা ফুটবল ম্যাচও আমরা কাটাছেঁড়া করতে পারছি। একটা টিমের সঙ্গে অন্য একটার তুলনা করতে পারছি। খোলসা করেই বলি। ফুটবল ম্যাচকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি। দু' দলের ফরোয়ার্ড লাইন আর ডিফেন্স—কতটা দক্ষ, পালটাপালটি করে আমরা সেটা যাচাই করব। এই ম্যাচে যেমন মোহনবাগানের অ্যাটাকিং লাইন কতটা দক্ষ, সেটা প্রথমে যাচাই করব মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ডিফেন্সের বিরুদ্ধে তারা কেমন খেলেন তা দেখে। এর জন্য চল্লিশ পয়েন্ট। এর পর উলটোটা হবে, অর্থাৎ কিনা, মহমেডানের ফরোয়ার্ড লাইন মোহনবাগান ডিফেন্সের বিরুদ্ধে কেমন খেলছে সেটাও দেখা হবে।

এর জন্যও বরাদ্দ চল্লিশ পয়েন্ট। তা হলে দাঁড়াল মোট আশি পয়েন্ট। বাকি কুড়ি পয়েন্ট গোলকিপিং দক্ষতার জন্য। ম্যাচ চলার সময়ই পয়েন্টগুলি দেবেন ওই তিন বিচারক, যাঁদের নাম আপনাকে আগে বলেছি। এর পরও একটা কথা আছে। প্রতি দশ পয়েন্টে আমরা ধরব একটা করে গোল। একটা টিম যদি ৬০ পয়েন্ট পায়, আর অন্য দল ৪০, তা হলে ম্যাচের ফল দাঁড়াবে ৬-৪ গোলে। অর্থাৎ এক টিম অন্য টিমকে হারাবে ২-০ গোলে। এই পদ্ধতিটা আমাদের নিতে হচ্ছে টাইম মেশিনের সুবিধার্থে।"

এইসব অদ্ভুত নিয়ম-টিয়ম শুনে মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। এতসব অঙ্ক কষে একটা দলের উৎকর্ষ যাচাই করাও সম্ভব কি না, সে-প্রশ্নও জাগছিল। টাইম মেশিনের কথা অবশ্য আগেও পড়েছি—প্রোফেসর শঙ্কুর লেখা ডায়েরিতে। কিন্তু তাতেও সব কিছু পরিষ্কার হল না। এই কথা ভাবার মাঝেই নদুবাবুর পাশে উদয় হলেন ঢ্যাঙামতন এক ভদ্রলোক। হাতে ছোট একটা বাক্স, পোর্টেবল টাইপরাইটারের মতো। বাক্সটি নদুবাবুর হাতে তুলে দিয়ে ঢ্যাঙা ভদ্রলোক কী যেন বললেন, শুনতে পেলাম না। বস্তুত, গ্যালারির মাঝে এতক্ষণ বসে আছি, এত লোকের মাঝে। নদুবাবুর গলা ছাড়া আমি আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। কী অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়েছি, নিজেও জানি না। সেই ঢ্যাঙা লোকটি নদুবাবুর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলেই যাচ্ছেন। মুখের ভঙ্গি দেখে আন্দাজ করলাম, ছোট বাক্সটা নিয়ে সম্ভবত কোনও কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। তারপর, যেমনভাবে উদয় হয়েছিলেন, চোখের পলকে ঠিক তেমন ভাবেই ঢ্যাঙা ভদ্রলোক মিলিয়ে গেলেন। ঠিক সিনেমায় যেমনটি হয়, সেই রকম।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নদুবাবু এবার বললেন, "তা হলে ম্যাচটা শুরু করা যাক।" মাথায় চট করে একটা হেডফোন লাগিয়ে ছোট বাক্সটা কোলের উপর তুলে নিলেন তিনি। "এই হচ্ছে, টি এম এফ—ফোরটিন। ভাবা রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে আনা। খুবই সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি। একেবারে যাকে বলে কম্পিউটারাইজড। এই টাইম মেশিনটির সাহায্যে গত একশো বছরের ফুটবল আপনি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। সেই সময়ে উপস্থিতও হতে পারবেন। সে যাক, এবার মাঠের দিকে তাকান। দয়া করে আপনার মাথা থেকে হেডফোনটা খুলবেন না। আমি সাউন্ড বাড়িয়ে দিচ্ছি। এখন থেকে মাঠের সব কিছুই আপনি শুনতে পাবেন।"

সঙ্গে-সঙ্গে দু' কানে একটা তীক্ষ্ণ চিঁ-চিঁ শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর বিরাট একটা আওয়াজ। ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান টিম মাঠে নামার সময় ঠিক এই ধরনের আওয়াজই আমরা শুনতে পাই। নীল আর সবুজ আলোটা আর নেই। মাঠের সব কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি। সব কিছু দিনের আলোর মতো ঝকঝকে। মাইক্রোফোনে কে যেন বললেন, "বহু প্রত্যাশিত এই ম্যাচ আজ পরিচালনা করবেন খ্যাতনামা রেফারি ক্রেটন। তাঁকে সাহায্য করবেন পঙ্কজ গুপ্ত এবং রমাকান্ত গাঙ্গুলি।" সঙ্গে-সঙ্গে টানেল দিয়ে উঠে এলেন রেফারির পোশাক-পরা এক ইংরেজ আর দুই ভারতীয়। গ্যালারির দিকে হাত নাড়লেন ক্রেটন। কিন্তু কেউ টুঁ শব্দটি করলেন না। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, এই রেফারিটিকে দর্শকরা ঠিক পছন্দ করছেন না। আই এফ এ-র গোল্ডেন জুবিলি স্মারক পত্রিকায় এই ক্রেটন সাহেবের একটা ছবি দেখেছিলাম। গোষ্ঠ পালের মুখেও শুনেছি, ইংরেজদের দিকে টেনে খেলানোর ব্যাপারে ক্রেটনের খুব বদনাম ছিল।

নদুবাবুর গলা হেডফোনে শুনতে পেলাম। এইবার মোহনবাগান টিম মাঠে নামবে। কিন্তু টানেল দিয়ে বেরিয়ে এলেন একদল ইংরেজ ফুটবলার। মাঠ পর্যন্ত পৌঁছে

তাঁরা ছোটাছুটিও শুরু করে দিলেন। দু-একজনকে দেখলাম, ক্রেটনের সঙ্গে গল্পও করছেন। ইংরেজদের দেখে গ্যালারির দর্শকরা খুব চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। "কোথায় মোহনবাগান টিম ? আমাদের সঙ্গে চালাকি ? ইস্ট ইয়র্কশায়ার টিমকে নামিয়ে মোহনবাগান বলা হচ্ছে।" দর্শকরা দেখলাম, ইংরেজ টিমটা সম্পর্কে খুবই ওয়াকিবহাল। প্লেয়ারদের নাম ধরে টীকা-টিপ্পনিও করতে লাগলেন অনেকে।

পাশে তাকিয়ে দেখি, কোলের ওপর রাখা ছোট্ট বাক্সটা নিয়ে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন নদুবাবু। একবার সুইচ ঘোরাচ্ছেন, আর-একবার সাঙ্কেতিক লাল, সবুজ আর গোলাপি আলো কমাচ্ছেন-বাড়াচ্ছেন। কিছু একটা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, পারছেন না। আমার দিকে চোখ পড়তেই বললেন, "টাইম মেশিনটা সামান্য একটু ট্রাবল দিচ্ছে। ঘাবড়াবেন না, ঠিক হয়ে যাবে। এগারো সালে আই এফ এ শিল্ড ফাইনাল ম্যাচে মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এই ইস্ট ইয়র্কশায়ার। ম্যাচের দিন ওরাই আগে মাঠে নেমেছিল। তার মিনিট পাঁচেক পর মোহনবাগান। টাইম মেশিনে পাঁচ মিনিট ফাস্ট করে দিলেই ঝামেলা চুকে যেত। কিন্তু ফাস্ট ফরোয়ার্ড করার সুইচটা ঠাহর করতে পারছি না। তাই এই গণ্ডগোল। দেখুন, এখনই ইস্ট ইয়র্ক টিমটাকে ইরেজ করে দিচ্ছি।"

মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখি ভৌতিক কাণ্ড। ইস্ট ইয়র্কশায়ার টিম নেই। হেডফোনে নদুবাবুর গলা শুনতে পেলাম, দর্শকদের উদ্দেশে বলছেন, "আপনারা অধৈর্য হবেন না। মোহনবাগান দল এবার মাঠে নামছে। যাঁর হাতে বল তিনি দলের অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ি। তাঁর পিছনে গোলকিপার হীরালাল মুখার্জি, ডিফেন্ডার সুধীর চ্যাটার্জি, হাফব্যাক নীলমাধব ভট্টাচার্য, রাজেন সেন, মনোমোহন মুখার্জি, ডিফেন্ডার ভূতি সুকুল, ফরোয়ার্ড কানু রায়, হাবুল সরকার, অভিলাষ ঘোষ আর সবার শেষে বিজয়দাস ভাদুড়ি।"

চোখ কচলে দেখলাম, সত্যি-সত্যিই এগারোর শিল্ড-জয়ী দলের নায়করা টানেল দিয়ে উঠে এলেন। গায়ে সবুজ-মেরুন জার্সি, ঢোলা প্যান্ট। কারও পায়ে অ্যাঙ্কলেট, কারও শাড়ির পাড় জড়ানো। একমাত্র সুধীর চ্যাটার্জি ছাড়া আর কারও পায়ে বুট নেই। খুবই সুশৃঙ্খলভাবে ওই এগারোজন মাঠের মধ্যিখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। মাঠের পূর্ব দিকে বিরাট ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ড। এগারোজনের পরিচিতি জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্কোর বোর্ডের পরদায় এক-একজনের মুখ ভেসে উঠছে আর মাইক্রোফোনে তাঁর নাম আর কৃতিত্ব নাটকীয়ভাবে জানাচ্ছেন ঘোষক। গলাটা খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। ঘোষক কি নামকরা ভাষ্যকার বেরি সর্বাধিকারী ? হয়তো হবে। দর্শকরা তুমুল অভিনন্দন জানালেন শিবদাস ভাদুড়িকে। যখন শুনলেন ফাইনাল ম্যাচে জয়সূচক গোলটা শিবদাসবাবুই করেছিলেন। পরিচিতির পালা শেষ হয়ে গেল। অবাক লাগল দেখে, মোহনবাগান মাত্র এগারোজনের দল এনেছে। শিল্ড-জয়ী দলে কি রিজার্ভ কোনও প্লেয়ার ছিল না ? কেউ চোট পেলে মোহনবাগানকে কি তা হলে দশজনেই খেলতে হত ?

মাঠের মধ্যে আশি বছর আগের একটা টিমকে চোখের সামনে দেখে একটু উত্তেজনাও অনুভব করছিলাম। নদুবাবুর কথা একটু-একটু করে বিশ্বাস হচ্ছে। সত্যিই তা হলে আমার সামনে এমন একটা ম্যাচ হতে যাচ্ছে, যা আধ ঘণ্টা আগে ভাবতেও পারতাম না। ঘোষকের গলা ভেসে এল, "এবার মহমেডান স্পোর্টিং দল মাঠে নামছে। খেলোয়াড়দের নামগুলো পর পর বলে যাচ্ছি। টিমের অধিনায়ক আব্বাস, গোলকিপার ওসমান, দুই ব্যাক জুম্মা খান আর সিরাজুদ্দিন, হাফ ব্যাক মাসুম, নুর মহম্মদ আর রসিদ খান, ফরোয়ার্ড লাইনে নুর জুনিয়ার, রহিম, রসিদ আর সাবু।"

গ্যালারি থেকে যেন গর্জন উঠল। মনে হল, দর্শকদের দুই-তৃতীয়াংশই মহমেডানের সমর্থক। একজন উৎসাহী দর্শক বিরাট একটা টাকার মালা পরিয়ে দিয়ে এলেন গোলকিপার ওসমানের গলায়। মাথায় কোঁকড়া চুল, পাঠানদের মতো শরীর। ওসমান সেই মালা জুম্মা খানের হাতে তুলে দিলেন।...দু' দলের খেলোয়াড়রা মাঠের মাঝখানে সার বেঁধে দাঁড়ালেন। তিনি বিচারকের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ও করিয়ে দেওয়া হল। আর তারপরই হঠাৎ মাঠে নৈঃশব্দ্য নেমে এল। নদুবাবু আমাকে বললেন, "খেলা এবার শুরু হয়ে গেল। একটা কথা আপনাকে জানানো দরকার বলে মনে করছি। এই ম্যাচের বাজির দর ৯-৬। মহমেডানের পক্ষে। প্রচুর লোক বাজি ধরেছেন। কয়েক কোটি টাকার ব্যাপার।"

যাই হোক, খেলা সত্যি-সত্যিই শুরু হয়ে গেল। আর চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই গোল ! তাও মাত্র চার টাচে। অভিলাষ ঘোষ কিক অব থেকে বল দিলেন লেফট উইংয়ে শিবদাসকে। রাইট ব্যাক জুম্মা খানকে ছোট্ট ডজে কাটিয়ে নিয়েই শিবদাস তরতর করে উঠে গেলেন কর্নার পোলের কাছে। ততক্ষণে জায়গা বদলে রাইট ইন হাবুল সরকার চলে এসেছেন লেফট ইনে। শিবদাসকে বাধা দিতে এসেছিলেন রাইট হাফ মাসুম। তিনি ট্যাক্‌ল করতে যাওয়ার আগেই শিবদাস বল বাড়িয়ে দিলেন হাবুল সরকারের উদ্দেশে। বলটা না ধরে ছোট্ট একটা টোকা দিলেন হাবুল। অভিলাষ ঘোষ যেন আগেভাগেই জানতেন, বলটা কোথায় পাবেন। বল ধরেই হাফ টার্নে তিনি দুর্দান্ত শট নিলেন গোল লক্ষ্য করে। গোলকিপার ওসমানের দু' হাতের ফাঁক দিয়ে বল গোলে ঢুকে গেল। রেফারি ক্রেটন কিন্তু গোল দিলেন না। অভিলাষের দিকে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন, অফ সাইডে ছিলেন।

গোল না হলেও, দুটো ব্যাপার বেশ নজরে পড়ল। এক, মোহনবাগান ফরোয়ার্ড লাইনের সমঝোতা আর জায়গা বদল করে খেলা। দুই, ওসমানের অদ্ভুত বল গ্রিপিং। আমাদের দেশে পাঁচ ফরোয়ার্ডের ছকে যখন খেলা হত, সেই সময় জায়গা বদল করে খেলাটা তেমন চালু ছিল না। দুই ইনসাইড উঠে-নেমে খেলতেন। দুই আউট সাইড ভেতরে ঢুকতেন না। সেন্টার ফরোয়ার্ড ঘুরঘুর

করতেন গোল এরিয়ায়। পঞ্চাশের দশকে এই খেলাটা আমূল বদলে দেন হাঙ্গারির কোচ গুস্তাভ সিবেস। তাঁর সময়েই পুসকাস, হিদেকুটি আর কোজিসরা নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করে খেলে সারা বিশ্বকে চমকে দেন। কিন্তু পুসকাসদেরও চল্লিশ বছর আগে সেই খেলাটা মোহনবাগানের ফরোয়ার্ডদের খেলতে দেখে অবাক হলাম। সেই সময় কোচ-ফোচ ছিল না। টিম দেখতেন নাকি শিবদাস ভাদুড়িই। দেখে ভাল লাগল, ফুটবল নিয়ে শিবদাস তা হলে সে-সময় গভীর চিন্তাভাবনা করতেন।

ওই অল্প সময়ের মধ্যে আর চোখে পড়ল গোলকিপার ওসমানের গ্রিপিং। তিরিশের দশকে এই ওসমান ছিলেন কলকাতা লিগের সেরা স্টাইলিশ গোলকিপার। কোয়েটার লোক। এখন ওই জায়গাটা পাকিস্তানে। তিরিশের দশকের সেই সময়টায় মহমেডানের সেক্রেটারি আবদুল আজিজ। কোয়েটা থেকে বলিষ্ঠ চেহারার চার-পাঁচজন প্লেয়ার তিনি ধরে এনেছিলেন। জুম্মা খান, ওসমান তাঁদেরই অন্যতম। যাই হোক, ওসমানকে দেখলাম, বল ধরার চেষ্টা করলেন, দুই পাশ থেকে হাত এনে। এখনকার গোলকিপাররা তো এভাবে বল গ্রিপ করার কথা ভাবতেই পারেন না। তাঁরা দুই হাত বলের পিছনে নিয়ে যান। কী জানি, হয়তো সে যুগে ওসমানের ওই গ্রিপিংই হয়তো ছিল তাঁর স্টাইল!

এইসব ভাবছি, খেলা ততক্ষণে বেশ কিছুটা সময় এগিয়ে গেছে। খেলা তখনও ড্র। মোহনবাগান চেপে ধরেছে। আরও দু' বার গোলের সুযোগ পেলেন অভিলাষ ঘোষ আর রাজেন সেন। কিন্তু একবার ছর্‌রা মেরে বাঁচিয়ে দিলেন ব্যাক সিরাজুদ্দিন। আর অন্যবার রাজেন সেনের হেড-করা বল ফিরিয়ে দিলেন জুম্মা খান। নদুবাবু আমাকে বললেন, "ওই সিরাজুদ্দিনকে দেখছেন, কার ভাই জানেন? ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের। মহমেডানের এই দলটায় মাত্র দু'জন বাঙালি ছিলেন। ক্যাপ্টেন আব্বাস আর এই সিরাজুদ্দিন।"

খেলার মধ্যে ক্রমশই ডুবে যাচ্ছি। হেডফোনে মাঝে-মাঝে একটা তীক্ষ্ণ চিঁ-চিঁ শব্দ শুনছি। রেডিও-র অজানা স্টেশন ধরলে যেমনটি হয়। ফাঁসের মতো মাথায় চেপে বসে আছে যেন হেডফোনটা। একটু অস্বস্তিও হচ্ছে। মাঠের দিকে নজর দিলাম। এবার মহমেডান ফরোয়ার্ড লাইন জোরালো আক্রমণ করছে। রসিদ, রহিম আর সাবুর মধ্যেও দেখলাম দারুণ সমঝোতা। বল দেওয়া-নেওয়া করে তাঁরা চমৎকার এগোচ্ছেন। কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলছেন গোলের কাছাকাছি গিয়ে। সুন্দর পজিশনাল প্লে দেখলাম, মোহনবাগানের রাইট ব্যাক সুধীর চ্যাটার্জির খেলায়। সেই শিল্ড-জয়ী টিমের সবথেকে কমজোরি প্লেয়ার ছিলেন এই সুধীর চ্যাটার্জি—অনেকের মুখেই এ-কথা শুনেছি। আমার কিন্তু তা মনে হল না। রহিম আর রসিদ বল ধরলেই উৎসাহে ফেটে পড়ছে গ্যালারি। ভুতি সুকুল একবার কড়া ট্যাক্‌ল করলেন রহিমকে। গ্যালারি থেকে দু-একটা ইট উড়ে গেল রেফারি ক্রেটনকে লক্ষ্য করে।

সমর্থকদের খুশি করার জন্যই বোধ হয়, ক্রেটনসাহেব দৌড়ে গিয়ে খুব ধমকে দিলেন সুকুলকে। এ ছাড়া আর কিই-বা করতে পারতেন তিনি? সেই সময় তো আর হলুদ কার্ড বা লাল কার্ডের নিয়ম ছিল না!

একটু সময় বাদেই, মহমেডানের মাসুম পিছন থেকে ট্রিপ করলেন বিজয়দাস ভাদুড়িকে। গোল এরিয়ার সামান্য বাইরে ডান দিকে। ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিক। ক্রেটনের এই সিদ্ধান্তে কিন্তু সমর্থকরা সন্তুষ্ট হলেন না। আবার চার-পাঁচটা ইট উড়ে গেল মাঠের মধ্যে। এখন পেশাদার ফুটবলে একে বলে 'গেমসম্যানশিপ'। এটা তা হলে তখনও ছিল!

ফ্রি-কিক নিচ্ছেন শিবদাস। তাঁর ফরোয়ার্ডরা এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে। শিবদাসেব সামনে পাঁচ ডিফেন্ডারের দেওয়াল। আর তার পিছনে গোলকিপার ওসমান। দেওয়ালটা আরও জমাট করার জন্য চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন ওসমান। তারপর নিজে ডান গোলপোস্টের দিকে সরে দাঁড়ালেন। ক্রেটন বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছেন। শিবদাস শট নিতে যাবেন। ঠিক এই সময় তাঁর নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে এগিয়ে এলেন দাদা বিজয়দাস। হাত নেড়ে এমন ভঙ্গি করলেন, শিবদাস যেন ফ্রি-কিক না নেন। দু' ভাইয়ের মধ্যে কী যেন কথাও হল। আর কথা বলার মাঝেই শিবদাস বল ঠেলে দিলেন দাদাকে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, গা-আলগা দেওয়া মহমেডান ডিফেন্ডাররা সজাগ হয়ে ওঠার আর সুযোগই পেলেন না। জোরে শট নেওয়ার ভঙ্গি করে বিজয়দাস প্রথমে ডিফেন্সের দেওয়াল ভেঙে দিলেন। তারপর, ভেতরে ঢুকে আসা হাবুল সরকারকে লক্ষ্য করে বল তুলে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ডাইভিং হেড। গোলকিপার ওসমান কিন্তু ঠিক জায়গায় সরে এসেছিলেন। কিন্তু হাবুল সরকার অত ঝুঁকি নিয়ে, শূন্যে শরীর ভাসিয়ে হেড দেবেন ভাবতেই পারেননি। দু' জনের শরীরে লাগল প্রচণ্ড ধাক্কা। দু'হাতে মাথা চেপে শুয়ে রইলেন হাবুল সরকার। আর বুকে হাত দিয়ে জমিতে ছটফট করতে লাগলেন ওসমান। দূর থেকে আমার মনে হল, পাঁজরের কোথাও তাঁর চোট লেগেছে। এবং বেশ ভাল চোটই।

ব্যস, গ্যালারিতে যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল। মাঠে ফেন্সিং নেই। চারপাশের গ্যালারি থেকে হুড়মুড় করে কিছু লোক মাঠে নেমে গেলেন। তাড়া করলেন ক্রেটনকে। ইট, ছাতা, জুতো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে বোমার আওয়াজ। বিশৃঙ্খল অবস্থা। মাঠে পুলিশও ঢুকে পড়ল।

দু' দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কাঁদানে গ্যাসের তীব্র ঝাঁঝ চোখে এসে লাগল। পাশে তাকিয়ে দেখি নদুবাবু নেই। পালিয়ে গেছেন। যাওয়ার সময় টাইম মেশিনটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন। গ্যালারির উত্তর দিকে পুলিশ হোস পাইপে জল ছেটাচ্ছে। দর্শকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য দেখলাম, ডজন খানেক বিরাট চেহারার অ্যালশেসিয়ান কুকুরও পুলিশ গ্যালারিতে ছেড়ে দিয়েছে। তাতেও দর্শকদের সামলানো যাচ্ছে না। একজন দর্শক আমার পাশ দিয়ে নেমে গেলেন, হাতে রিভলভার। ওই ভয়ানক পরিস্থিতিতে কী করব ভাবছি। এমন সময় ঠকাস করে আধখানা ইট এসে পড়ল আমার হেডফোনে···।

আর তারপরই—বাঁকেলালের ডাক শুনতে পেলাম। গাড়ি স্টার্ট নিতে-নিতে ও বিরক্তির সুরে বলল, "শুধু-শুধু আধ ঘণ্টা নষ্ট হল।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

Amela-4 (2.5.90)

কম্পিউটার প্রোগ্রাম

কম্পিউটার ও আমাদের সুবিধের জন্য তৈরি হয়েছে উঁচুমানের প্রোগ্রামের ভাষা। লিখেছেন **অসীমরতন ঘোষ**।

বেড়াতে গিয়ে তুমি আবিষ্কার করলে একটা পোড়োবাড়ি। রহস্যের খোঁজ করতে-করতে হঠাৎই খুঁজে পেলে মধ্যযুগের ভাষায় লেখা এক পুঁথি। অনেক ভাবনা-চিন্তা করার পর দেখতে পেলে এর মধ্যে লুকনো আছে অদ্ভুত এক সঙ্কেত। তাতে বলা হচ্ছে : চণ্ডীতলা থেকে হাজার হাত পূর্বে যাও। বাঁ দিকে বাস্তুশিলার খোঁজ করো। তার একশো হাতের মধ্যে পিপুল গাছ খুঁজে বার করো। তার নীচে আছে এক আশ্চর্য বস্তু। সেই পিপুল গাছের নীচে কী আছে জানি না, তবে এই সঙ্কেতটিকে দারুণ একটা অ্যালগরিদম বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

কম্পিউটারকে দিয়ে যে-কোনও কাজ করাতে দরকার হয় প্রোগ্রাম লেখার। এর জন্য প্রয়োজন হয় অ্যালগরিদমের। এটি হল কোন কাজের পর কোন কাজ করলে

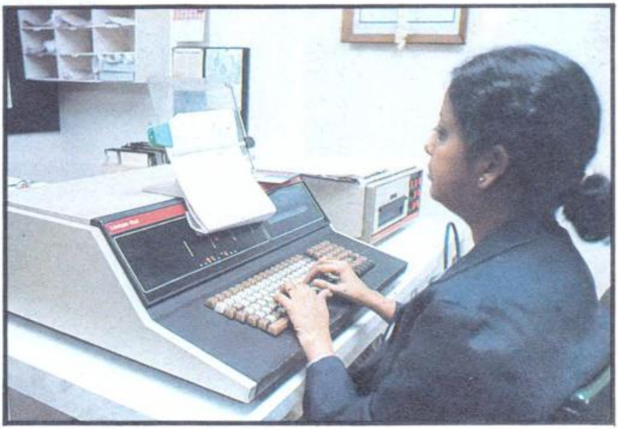

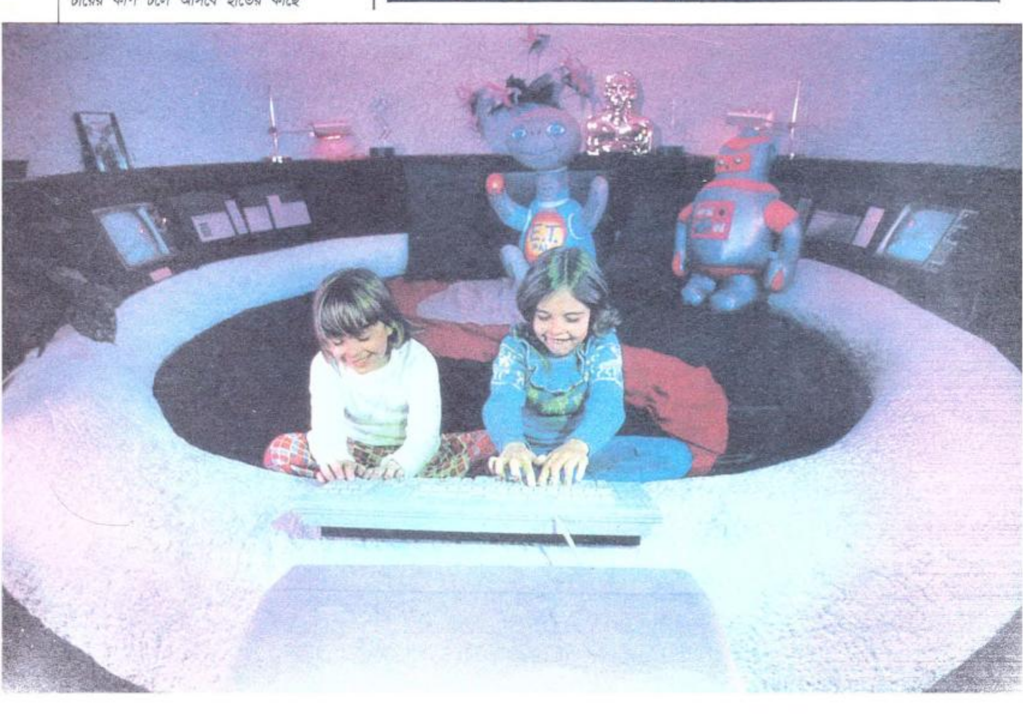

খেলাঘরের বিছানায় বসে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ ব্যস্ত ফ্লোরিডার দুই শিশু। অদূর ভবিষ্যতে বিছানায় বসে কম্পিউটারের সাহায্যেই রান্নাঘর থেকে গরম চায়ের কাপ চলে আসবে হাতের কাছে

কম্পিউটার পুরো কাজটি সেরে ফেলতে পারবে তার তালিকা।

আসলে কম্পিউটারকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে হলে তাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু বলে দিতে হয়। কারণ কোনও বুদ্ধিই ওর নেই। তাই 'এই অঙ্কটা কষে দাও' বা 'এই সমস্যার সমাধান কী' বললে কম্পিউটার কোনও উত্তরই দেবে না, যদি তুমি তাকে আগে থেকেই সমাধানের পথ বাতলে না দাও। এই সমাধানের পথ বলে দেওয়ার কাজটাও করতে হবে খুব সরল কিছু বিবৃতির মারফত। কম্পিউটার আমাদের ভাষা পড়তে পারে না। সে শুধু বোঝে যন্ত্রের নিজস্ব ভাষা। তার আর আমাদের সকলের সুবিধের জন্য তৈরি হয়েছে উঁচুমানের প্রোগ্রামের ভাষা। কাজেই আমাদের ভাষায় লেখা অ্যালগরিদম সে পড়তে পারে না।

অ্যালগরিদমকে অবলম্বন করে লেখা হয় কম্পিউটার প্রোগ্রাম। প্রোগ্রাম লেখা হয় বেসিক কোবল বা ফোর্ট্রানের মতো ভাষায়। অ্যালগরিদম, প্রোগ্রাম লেখা, বোঝা আর পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজনীয়। এটি হল প্রোগ্রামের খসড়া।

ছোট-বড় যে-কোনও কাজ করাতে গেলেই লিখতে হয় প্রোগ্রাম। তার প্রতিটি বিবৃতি হবে সরল, দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন। সেই কারণে সরাসরি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর ভাষায় প্রোগ্রাম না লিখে প্রথমে সমস্যা সমাধানের যুক্তিগুলো পর-পর সাজিয়ে নেওয়া হয়। এজন্যই লেখা হয় অ্যালগরিদম। অনেকেই মনে করেন একে ভিত্তি করে প্রোগ্রাম না লিখে, প্রবাহী চিত্র নামে এক ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া ভাল। সামন্তরিক, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত এরকম নানা নির্দিষ্ট চিহ্নের মধ্যে লেখা হয় নানারকম বিবৃতি (রেখাচিত্র—১)।

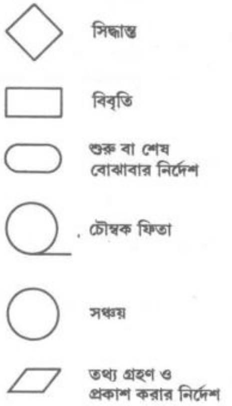

রেখাচিত্র—১

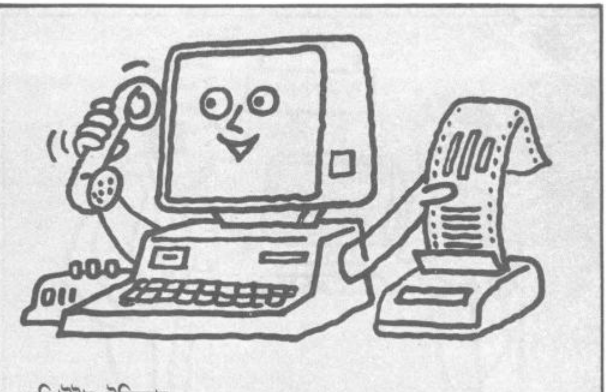

কম্পিউটার টেলিফোন

কম্পিউটার মারফত পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তথ্য পাঠাবার ব্যবস্থা অনেকদিন আগে থেকেই চালু আছে। মোডেম নামে এক যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে এরকম সংযোগ-ব্যবস্থার সঙ্গে জোড়া যেতে পারে পার্সোনাল-কম্পিউটারকে। নতুন কম্পিউটার-টেলিফোন-এর মাধ্যমে এখন থেকে পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় শুধু তথ্যই নয়, কণ্ঠস্বরও আদান-প্রদান করা সম্ভব হবে। লিখিত তথ্যের সঙ্গে কোনও কিছু সংযোজন বা সংশোধনের কাজও করা যাবে এই টেলিফোনের সাহায্যে।

যেমন ধরো কোনও দৈর্ঘ্যকে তুমি ফুটের বদলে গজে প্রকাশ করতে চাও। তা হলে আমাদের সংখ্যাটিকে তিন দিয়ে গুণ করতে হবে। কারণ তিন ফুটে এক গজ। তা হলে প্রবাহী চিত্রটি হবে রেখাচিত্র—২-এর মতো।

এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো, 'কী করতে হবে তা যদি আমি এত বিস্তারিতভাবে বলেই দেব তা হলে কম্পিউটারের দরকার কী ?' কথাটা কিছুটা ঠিকই। সহজ সরল সমস্যার সমাধান কম্পিউটারকে দিয়ে করাতে চাইলে অনেক সময়ই পরিশ্রম অনুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। তবে সরল কাজও যদি বারবার করতে হয় তা হলে যথেষ্ট বিরক্তির সৃষ্টি হয়। কম্পিউটার কিন্তু একেবারেই বিরক্ত হয় না। সে নিরলস ও নির্ভুলভাবে কাজ করে দেবে তার অসম্ভব দ্রুততা আর প্রখর স্মৃতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে।

তবে মানুষের বুদ্ধি ছাড়া সে একেবারেই অচল। কম্পিউটার আজও মানুষের বুদ্ধিকে অতিক্রম করতে পারেনি, আজও সে যন্ত্রই।

আবার আমরা একটা উদাহরণের দিকে লক্ষ করি : আজ প্র্যাকটিক্যাল খাতা জমা দেওয়ার শেষ দিন। স্কুলে এসে দেখলে শেষ এক্সপেরিমেন্টের ফলটা কষে বার করা

রেখাচিত্র—২

সর্ষের মধ্যে ভূত

চোর আর জালিয়াতদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পৃথিবীর বহু ব্যাঙ্কে কম্পিউটার বসেছে। আমেরিকার একটি ব্যাঙ্কে হঠাৎই দেখা গেল কারও-কারও অ্যাকাউন্ট থেকে আস্তে-আস্তে টাকার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। কারও-কারও অ্যাকাউন্টে আবার টাকা বেড়ে যাচ্ছে। ব্যাঙ্কের মোট টাকা কিন্তু একই থাকছে। নানারকম ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও এই অপরাধ বন্ধ করা যাচ্ছিল না। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর অপরাধী ধরা পড়ল। অপরাধীটি ২১ বছরের এক কিশোর। সফটওয়্যার তৈরিতে সে দারুণ পারদর্শী। একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখে সে এই অপকর্মগুলো চালাচ্ছিল। নিরাপত্তার কারণে কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু হল ঠিকই, কিন্তু যদি গোড়ায় গলদ থাকে, তা হলে উপায়? সারা পৃথিবী এখন এইরকম অপরাধীদের ভয়ে তটস্থ।

তৈরি হচ্ছে প্রোগ্রামের খসড়া

হয়নি। হিসেবের এক জায়গায় ৫৩·৭৮-এর পঞ্চম মূল (Root) বার করতে হবে। ক্যালকুলেটর দরকার। কিন্তু সেটা তো বাড়িতে পড়ে! কী উপায়? তুমি ভাবলে বাড়িতে বোন রয়েছে। ওকে হিসেবটা করে দেওয়ার জন্য তুমি ফোন করলে। কিন্তু ফোন তুলল তোমাদের বাড়ির কাজের লোক হারাধনদা। বাড়িতে আর কেউ নেই। কাজটা হারাধনদাকে দিয়েই করাতে হবে।

তুমি বললে টেবিলের ওপর থেকে (১) ক্যালকুলেটরটা নাও। (২) ON লেখা বোতামটা টেপো। (৩) পর-পর এই বোতামগুলো টেপো: ৫, ৩, দশমিক, ৭, ৮। (৪) পর-পর দুবার গুণচিহ্ন লেখা বোতামটা টেপো। (৫) দশমিক এবং ২ লেখা বোতাম

রেখাচিত্র—৩

রেখাচিত্র—৪

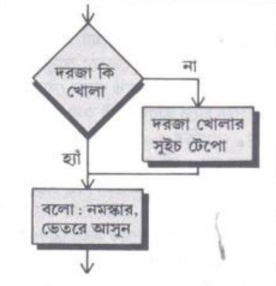

রেখাচিত্র—৫

দুটো পর-পর টেপো (১/৫ লিখতে)। (৬) পরদায় ফুটে ওঠা সংখ্যাটি বলো। এইভাবে তুমি,যে আদৌ ক্যালকুলেটর চালাতে জানে না,তাকে দিয়ে অঙ্কটা করিয়ে নিলে।

কম্পিউটারের সঙ্গে হারাধনদার একটা ব্যাপারে মিল রয়েছে। এরা কাজগুলো করতে পারে, কিন্তু নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে পুরো সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

কম্পিউটারকে প্রোগ্রাম লেখার ভাষায় এভাবে পাখিপড়া করে কোন কাজ কীভাবে করতে হয় তা শিখিয়ে দিলে সে যে-কোনও কাজই করে দিতে পারবে।

আমরা আগেই দেখেছি প্রোগ্রাম লেখার প্রথম ধাপ অ্যালগরিদম লেখা—অর্থাৎ কাজটা ছকে ফেলা। ফ্লোচার্ট হল অ্যালগরিদমের সচিত্র রূপ। তবে আজকাল অনেকেই ফ্লোচার্টের বদলে সিউডো কোড বা ছদ্ম-সঙ্কেত নামে এক ব্যবস্থার সাহায্য নিচ্ছেন। কিছুটা দৃঢ় কিছুটা নমনীয় এই পন্থায় ইংরেজি, বাংলা, ফ্রেঞ্চ বা যে-কোনও ভাষাতেই একে লেখা যায়। এই ছদ্ম-সঙ্কেতকে অবলম্বন করে বেসিক, ফোর্ট্রান বা পাস্কালের মতো যে-কোনও প্রোগ্রাম লেখার ভাষায় তাকে অনুবাদ করে ফেলা যায়।

এবার আমরা প্রোগ্রাম লেখার মূল কাঠামোগুলোর একটু খোঁজখবর নিয়ে নিই। মনে করো, তুমি জন্মদিনের উপহার হিসেবে একটা রোবট পেয়েছ। রোবটটার জায়গা হয়েছে বাইরের ঘরের এককোণে। তাকে কিছু

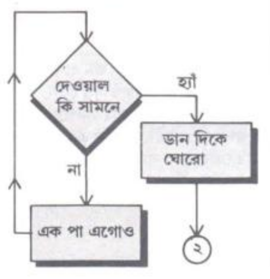

রেখাচিত্র—৬

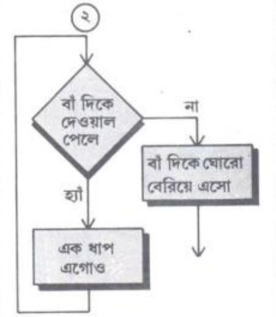

রেখাচিত্র—৭

কাজ শিখিয়ে দিতে চাও (রেখাচিত্র—৩)। প্রথমে শেখাও কীভাবে বাইরের দরজার কাছে যেতে হবে। তা হলে প্রথমে তাকে রাস্তার দিকের দেওয়ালে পাঠাও। তার পরে ডান দিকে বাঁক নিতে বলো। এবার আরও পাঁচ মিটার এগোলেই পাওয়া যাবে সেই দরজা। রেখা চিত্র-৪-এ এর ফ্লোচার্টটা দেখানো হল।

অনেক সময়ই রোবট বা কম্পিউটারকে প্রোগ্রামের কিছু নির্দেশ পর-পর পালন করতে বলা হয়। এইরকম কাঠামোকে ক্রমনিয়ন্ত্রিত গঠন বলা হয়।

অনেক সময় কোনও প্রশ্নের উত্তরের (সত্যি বা মিথ্যে) ওপর ভিত্তি করে কোন কাজ করা

কম্পিউটার কীভাবে এল

১৯৬০
ভারতে প্রথম কম্পিউটার এল।

১৯৬৩
প্রথম মিনি কম্পিউটার।

১৯৬৪
প্রথম বেসিক প্রোগ্রাম।

১৯৬৪
প্রথম সুপার কম্পিউটার।

১৯৭০
ক্যাড ও ক্যাম ব্যবস্থার শুরু।

১৯৭০
সেমিকন্ডাক্টর লেজার ও অপটিকাল ফাইবারের ব্যবহার শুরু।

ডি ই সি- পি ডি পি-৮,প্রথম মিনি কম্পিউটার

আধুনিক ফাইবার অপটিক তার

১৯৭০
প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর চিপ।

১৯৭১
মানুষের ভাষায় কম্পিউটারের সঙ্গে কথা বলা শুরু।
ভাষার জন্ম।

১৯৭১
প্রথম পার্সোনাল কম্পিউটার।

১৯৭৯
ভিসিক্যালকের সূচনা।

১৯৮৩
অপটিকাল ট্রানজিস্টরের পরীক্ষামূলক সূচনা।

(সমাপ্ত)

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর নানা ভাষা

ঐরা ফোরট্রান ভাষা তৈরি করেন

ফোরট্রান

ফরমুলা ট্রানস্লেশন—এই শব্দ দুটো থেকে ফরট্রান বা ফোরট্রান নামটি এসেছে। জন ব্যাকাস ও অন্যান্যদের এই শক্তিশালী ভাষা তৈরির পর তেত্রিশ বছর কাটল। আজও লুপ্ত হয়নি, বরং দারুণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা কাজে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে যেখানে প্রচুর তথ্যের আদান-প্রদান হয় এবং বহু তথ্যই অক্ষর দিয়ে তৈরি, সেখানে এ-ভাষা খুব কার্যকরী নয়। তবে গাণিতিক কাজকর্মে এর তুলনা নেই। ফোরট্রানের নানা সংস্করণ : ফোরট্রান, ফোরট্রান-২, ফোরট্রান-৪, ফোরট্রান-৭৭ এবং অতিসাম্প্রতিক ফোরট্রান-৮ এক্স।

টমাস কুর্জ ও জন কেমেনি : বেসিকের নির্মাতা

বেসিক

বিগিনার্স অল-পারপাস সিমবলিক ইন্সট্রাকশন কোড শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হয়েছে এই নাম। বড় কম্পিউটারে একসঙ্গে অনেকে কাজ করলে এর মস্তিষ্ক বা CPUকে দারুণভাবে কাজে লাগানো যায়। এই ব্যবস্থাকে সময়-বণ্টন ব্যবস্থা বলে। এর উপযোগী এই ভাষাটি জন কেমেনি ও টমাস কুর্জ যাট দশকের মাঝামাঝি আবিষ্কার করেন। অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে দারুণ পাণ্ডিত্য ছাড়াই খুব সহজে প্রোগ্রাম লিখতে কিংবা এর সম্পাদনা করতে কোনও অসুবিধেই হবে না। পার্সোনাল কম্পিউটারের পক্ষে এটি আদর্শ ভাষা। ফোরট্রানের সঙ্গে এর প্রচুর মিল। বেসিকের প্রধান সমস্যা এর অসংখ্য সংস্করণ, একটি যন্ত্র একটি ছাড়া অন্য কোনও বেসিক প্রোগ্রাম বুঝতে পারে না।

অ্যালগল

(অ্যালগরিদমিক ল্যাঙ্গুয়েজ)আমেরিকায় যখন হইহই করে ফোরট্রান ব্যবহৃত হচ্ছে, ইউরোপে তখন তৈরি হল পুরোপুরি গাণিতিক এই ভাষা। এর সমর্থক বিজ্ঞানীরা বলেন, এই ভাষা শেখা যেমন সহজ, ক্ষমতাও প্রচুর।প্রোগ্রামের ভাষার বিবর্তনে অবশ্য এটি দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে। অ্যালগল-৬৮ নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের একদল বেরিয়ে এসে তৈরি করেন পাস্কাল-ভাষা।

হবে তা ঠিক করা হয়। যেমন রোবটটি এখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে প্রশ্ন করো, দরজাটা কি খোলা ? উত্তর 'হ্যাঁ' হলে তাকে বলতে বলো, "নমস্কার, ভেতরে আসুন।" আর উত্তর 'না' হলে তাকে দরজা খোলার জন্য সুইচ টিপে তারপর ওই কথা বলতে বলো। রেখাচিত্র-৫-এ এর ফ্লোচার্টটি দেখানো হল। এটি হল নির্বাচনমূলক গঠন। অনেক সময় প্রোগ্রামের বেশ কিছু নির্দেশ কোনও একটি কাজের জন্যই বেশ কয়েকবার করতে হয়। আবার অনেক সময় বেশ কিছু লাইনের কাজ বাদ দিয়ে দিতে হয়। সেই কাজ করা হয় নির্বাচনমূলক গঠন ব্যবহার করে। কিছু নির্দেশ বারবার পালন করানোকে বলা হয় 'লুপ' বা 'আবর্ত'। এই আবর্তন কতবার হবে তা ঠিক হয় আবর্তস্থিত শর্ত অবলম্বন করে। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে এই শর্তটি যতক্ষণ সত্য থাকে ততক্ষণ আবর্তন চলতে থাকে। মনে করো, যতক্ষণ মাস্টারমশাই পড়াবেন ততক্ষণ তোমায় অঙ্ক করে যেতে হবে। তিনি না থাকলেই তোমার ছুটি।আর-একরকম ক্ষেত্রে একটি শর্ত সত্যি না হওয়া পর্যন্ত আবর্তন চলতে থাকে। যেমন, মনে করো, বাড়িতে মামা এলেই সেদিনের মতো ছুটি হয়ে যায়। মানে যতক্ষণ না মামা আসছেন তোমাকে লেখাপড়া করে যেতে হবে।

আবার আমরা ফিরে যাই রোবট নিয়ন্ত্রণের কাজে। মনে করো, ঘরের মধ্যে রোবটটি কোথায় আছে আমরা তা জানি না। ফলে বাইরের দরজায় যেতে গেলে এখন কোন দিকে কতটা যেতে হবে তা বলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা যদি কিছু আবর্ত আর নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার আয়োজন করি তা হলে এ-সমস্যার সমাধান করা যায়।

আমরা রোবটটিকে এক পদক্ষেপ এগোতে বলে জিজ্ঞেস করতে পারি, দেওয়াল কি সামনে ? যতক্ষণ না উত্তর 'হ্যাঁ' হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে এক-এক পদক্ষেপ এগোতে বলা যেতে পারে। সে দেওয়ালের সামনাসামনি এলে ডান দিকে ঘুরতে বলো (রেখাচিত্র—৬)। এবার সে যতক্ষণ পর্যন্ত দরজা না পায় ততক্ষণ তাকে এগোতে বলো। প্রত্যেক পদক্ষেপ এগনোর পর জিজ্ঞেস করো, 'তোমার বাঁয়ে কি দেওয়াল ?' উত্তর 'হ্যাঁ' হলে বলো এক পদক্ষেপ এগোও, 'না' হলে অর্থাৎ দরজা পেলে বাঁ দিকে ঘোরো এবং বেরিয়ে এসো (রেখাচিত্র—৭)। (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

চিত্রণ : নীলরতন মাইতি

ধারাবাহিক উপন্যাস

সোনার গণপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

তরুণী বলল, "আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে আমি খুব অল্পদিনের মধ্যেই তৈরি করে নিতে পারব।"

মউ বলল, "তা হলে আজই আমার হাতেখড়ি হোক। আপনি আমাকে আপনার রিভলভারটা কীভাবে ধরতে হয় একবার শিখিয়ে দিন। আমি ওই মৃতদেহটায় একটা গুলি করে আমার লক্ষ্যভেদ করি।"

"মৃতদেহে গুলি করে লাভ ?"

"এটা তো গুলির জন্য গুলি নয়। শুধু ট্রেনিং নেওয়া। তারপর যখন লড়াইয়ে নামব তখন দেখবেন, আমি কী করি। আমার লক্ষ্য সমাজের প্রতিটি স্তরের দুষ্কৃতিদের এক-এক করে শেষ করা।"

"ধরো যদি এইসব কাজ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ো ?"

"ধরা দেব। তবে এটুকু জেনে রাখবেন, পুলিশের সাধ্য নেই আমাকে জীবন্ত ধরার। সেরকম বুঝলে ধরা পড়ার পূর্ব মুহূর্তেই একটি গুলি অকৃপণভাবে খরচা করব আমি, আমার নিজের জন্য।"

"শাবাশ। এই নাও রিভলভার। এ-জিনিস তোমার হাতেই মানায়। তুমি বাংলার ফুলনদেবী হও।"

"মউ হাত পেতে রিভলভারটা নিল।

"এইভাবে ধরো।"

যেভাবে বলল সেইভাবেই ধরল মউ।

তরুণী বলল, "এইখানটায় শক্ত করে ধরে ট্রিগারটা টিপে দেবে। যদি অসুবিধে মনে করো, তা হলে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জির কাছটা শক্ত করে ধরে থাকতে পারো। নাও রেডি ! ওয়ান-টু··· ।"

মউ সেটা হাতে নিয়ে একপা-একপা করে নির্দেশ অনুযায়ী এগোতে লাগল মৃতদেহটার দিকে। তারপর কয়েক পা গিয়ে হঠাৎই ঘুরে দাঁড়াল।

তরুণী বলল, "কী হল ভয় পেলে ?"

"না।"

"তবে ?"

"ভাবছি মৃতকে মেরে লাভটা কী ? জীবনে প্রথম টার্গেটের গুলিটা তো জীবন্ত মানুষকে মেরেই খরচা করা উচিত ?"

"তার মানে ? কী বলতে চাইছ তুমি ?"

"যা বললাম তা তো বাংলাতেই বললাম। বুঝতে পারছেন না ?"

ভয়ে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল তরুণীর। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "এ কী ! তুমি অমন করে তাকাচ্ছ কেন আমার দিকে ? তুমি এক পা, এক পা করে আমার দিকে এগিয়ে আসছ কেন ?"

"হত্যা করব বলে। আজ রাতে আমি এমন এক বাঘিনীকে হত্যা করব যে এ-পর্যন্ত তেইশটি শিকার ধরেছে। আমার রিভলভারের একটি গুলিতে আমি তার হত্যালীলা বন্ধ করে দেব।"

"তার মানে তুমি আমাকেই মারবে ?"

বস্বার পছন্দ

প্রভাকর মাঝি

এই ছেলেটি কাজের যদি,
ওই ছেলে কি ফালতু ?
গড়িমসি এ করলে পর,
ও দৌড়োবে হালতু ।
পড়ে পড়ে এ করে দেয়
বইগুলোকে ছিবড়ে,
ও দ্যাখে সার বেঁধে কেমন
যায় পথে লাল পিঁপড়ে !
কাঁদছিল বোন চুমকি যখন
আঙুল কেটে কালকে,
এ কষছিল একমনে আঁক,
ও ডাক দিল পালকে ।

ফার্স্ট হয়ে এ নতুন ক্লাসে
ড্যাংডেঙিয়ে যাচ্ছে,
কোনোক্রমে টায়েটুয়ে
ও গণ্ডি টপকাচ্ছে ।
ব্যাটে বলে চৌখস ও
যা একখান দেয় গুগলি
কুইজের এ প্রাইজে যায়
আজ ঘোলা, কাল হুগলি ।
এক কেলাসের দু'ভাই তারা,
মিলমিশও নয় মন্দ—
এখন বলো বস্বা, তোমার
কোনজনা পছন্দ ?
দু' দিক থেকে দু'জন টানে
কে বেশি কে কম-বা !
বস্বা বলে, আমার চয়েস
বস্বা, বম্বা, বস্বা ।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

"হ্যাঁ । না হলে আপনার হাতে আরও কত প্রাণ যে অকালে ঝরে যাবে তার ঠিক নেই । আপনি এখন মৃত্যুর জন্য তৈরি হোন ।"

তরুণী ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "না-আ-আ ।"

কিন্তু করলে কী হবে ?

ততক্ষণে মউ কঠিন হাতে ট্রিগারটা টিপে দিয়েছে, ডিস্যুম ।

রক্তাপ্লুত তরুণী লুটিয়ে পড়ল পথের ধুলোয় । মউয়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল । একটু আগে যে মানবীর সঙ্গে ও কথা বলছিল, এই মুহূর্তে সেই মানবীর এইরকম একটা পরিণতি কী ভাবা যায় ? বিশেষ করে ও নিজে যার মৃত্যুর জন্য দায়ী । ও কী কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিল এত অল্প বয়সে ওর হাত দিয়েই একটি তাজা প্রাণ এইভাবে খসে পড়বে বলে ? অথচ এই বাঘিনীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না ।

এই হত্যাকাণ্ডের পর আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে গা ঢাকা দিল মউ । ঘটনাস্থল থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে একটি গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল । কেননা, অন্ধকার এখানে ঘন নয় । ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় সব কিছুই এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে । এখন ও কীভাবে কী করবে, কোথায় যে যাবে কিছুই ঠিক করতে পারল না । শুভঙ্কর এখন কতদূরে তাই বা কে জানে ? মোটরে তো অনেকটা পথ চলে এসেছে । এখন কি ও শুভঙ্করের কাছে ফিরে যাবে ? না এগিয়ে যাবে গিধনি হয়ে চিলকিগড়ের দিকে ? শুভঙ্করটা এখন কী করছে কে জানে ? আর তো কোনও গাড়িও আসছে না যে সেটাকে থামিয়ে একটু ম্যানেজ করবে । অবশ্য একটু আগে যা হয়ে গেল তাতে আর গাড়ি ম্যানেজের সাহস নেই ওর । বিশেষ করে সামান্য কিছু দূরেই যেখানে মারুতির পাশে তরুণীর তাজা লাশ পড়ে আছে, সেখানে কোনও গাড়িকে থামাতে গেলেই যে কেউ সন্দেহ করবে ওকে । হাজার হলেও ও এখন খুনি । এখন লোকজন ডেকে নিজেকে ধরিয়ে দেওয়ার চেয়ে পলাতকের ভূমিকা নেওয়াই ভাল । কিন্তু পালিয়ে ও যাবে কোথায় ? এই রাতে হাঁটা পথে এই পথ ধরে এগিয়ে যাওয়াও যেমন নিরাপদ নয়, তেমনি ওর পক্ষে সম্পূর্ণ এককভাবে এই গভীর রাতে চিলকিগড়ে গিয়ে ডুলুং নদী পার হওয়াও বিপজ্জনক ব্যাপার । একে এই দীর্ঘ পথ । তার ওপর গভীর জঙ্গল । মধ্যে বর্ষায় স্ফীত দুরন্ত ডুলুং । একজন কেউ সঙ্গে না থাকলে ভয় হয় । একেবারে একা কী এইসব কাজ করা যায় ?

যাই হোক, ও যখন বিশাল গুঁড়ির একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবছে তখন হঠাৎই দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি ট্রাক থামল সেখানে । আর সেই ট্রাকের ড্রাইভারের সিটের পাশ থেকে লাফিয়ে নামল শুভঙ্কর । ছুটে গেল সেই পড়ে থাকা মারুতিটার কাছে । তরুণীর লাশ দেখে শিউরে উঠল, এই তো ! এই তো সেই মহিলা । কিন্তু মউ কোথায় ? কোথায় গেল সে ?

সর্দারজিও তখন ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে এগিয়ে গেছেন শুভঙ্করের দিকে, "মিল গিয়া ও লেড়কি কো ?"

"না সর্দারজি । কী যে হল ব্যাপারটা কিছু বুঝতেই পারছি না । এই মহিলাই বা খুন হলেন কীভাবে, আর আমাদের মেয়েটিই বা কই ?"

মউ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল । এতক্ষণে আত্মপ্রকাশ করল সে । গাছের আড়াল থেকে ছুটে গেল শুভঙ্করের কাছে ।

বিস্মিত শুভঙ্কর জিজ্ঞেস করল, "এ কী, মউ ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি ?"

"ওই গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম ।"

"আমি তো ভাবলাম আবার নতুন করে কোনও বিপদ হল বুঝি তোমার ।"

"বিপদ হতে আর বাকি কী ছিল ? তবু ভাল যে ঠিক সময়ে তুমি এসে পড়লে। না হলে একা আমি দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়ছিলাম।"

শুভঙ্কর বলল, "ভাগ্যটা সত্যিই ভাল। না হলে আবার যে তোমাকে ফিরে পাব তা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি। এই সর্দারজি আমাকে দয়া করে ওঁর গাড়িতে তুলে নিয়েছেন। উনি সাহায্য না করলে এত তাড়াতাড়ি আমি তোমার কাছে আসতে পারতাম না।"

সর্দারজি তরুণীর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন, "এ ক্যা হাল হো গিয়া ?"

শুভঙ্কর বলল, "আপনাকে বলছিলাম না সর্দারজি, এই মহিলাই আমার বোনকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল।"

"লেকিন ইনকো মার্ডার কিনোনে কিয়া ?"

মউ বলল, "একটু আগে কয়েকজন লোক আমাদের গাড়ি থামিয়ে এই মহিলাকে মার্ডার করে পালিয়ে যায়।"

ততক্ষণে আরও কয়েকটি ট্রাক ও মোটর এসে থেমেছে, সবাই সবকিছু দেখেশুনে বলল, "এখানে অযথা ভীড় করা ঠিক নয়। যে-যার জায়গায় কেটে পড়ো।"

শুভঙ্কর সর্দারজিকে বলল, "সর্দারজি ! আপনি দয়া করে আমাদের আর-একটু নিয়ে চলুন। গিধনি এলেই নেমে পড়ব আমরা।"

সর্দারজি বললেন, "জলদি করো, চটপট। হিঁয়া ঠারনা ঠিক নেহি। লেকিন ইয়ে বাত কিসিকো মাত বোলনা।"

শুভঙ্কর আর মউ একটুও সময় নষ্ট না করে উঠে বসল ট্রাকের ভেতর।

ট্রাক ছুটে চলল গিধনির দিকে।

গিধনি এখান থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়। তাই আধ ঘণ্টার মধ্যেই গিধনিতে পৌঁছে গেল ওরা।

লেভেল ক্রসিং ডিঙিয়েই সর্দারজির ট্রাক নামিয়ে দিল ওদের। ওরাও সর্দারজিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল। এখানটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। এই জ্যোৎস্নালোকে দূরে কয়েকটি সাদা-সাদা ঘরবাড়ি দেখতে পেল ওরা। সে কী অপরূপ দৃশ্য।

মউ বলল, "আমি বাবার সঙ্গে একবার এখানে এসেছিলাম। ঠাকুরবাবার আশ্রম ওটা। দারুণ উৎসব হয় ওখানে। আর এই যে দেখছ বাঁ দিকের পথ, এই পথটা স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে আবার ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। দু' পাশে বন-জঙ্গল। তারই মাঝখান দিয়ে সুন্দর পিচ-ঢালা পথ। সেই পথ দিয়েই যেতে হবে আমাদের।"

"কতদূর ?"

"ওই তো বললাম তখন, প্রায় আট-দশ কিলোমিটারের পথ।"

ওরা সেই নির্জন পথ ধরে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল। খানিক যাওয়ার পরই দেখল বাঁ দিকের একটি পথ বাজারের পাশ দিয়ে স্টেশনে গিয়ে পড়েছে। একপাশে একটি শীতলা মন্দির। ওরা সেদিকে না গিয়ে ডান দিকের পথ ধরল। এই পথই সোজা চলে গেছে চিলকিগড় হয়ে দূরে দূরান্তরে।

মউ বলল, "এই পথ হেঁটে পার হওয়া অনেকটা সময়ের ব্যাপার। অথচ এখন এই মুহূর্তে না হাঁটা ছাড়া কোনও উপায়ই নেই।"

ওরা সেই নির্জনে শুরু করল পথ হাঁটা। এখানটা স্টেশন রোড। তাই দু' পাশে দোকানপত্তর। সব দোকানেরই ঝাঁপ বন্ধ। কেননা, এখন গভীর রাত। সবাই এখন গভীর ঘুমে অচেতন।

ওরা হাঁটা পথে সবে কিছুটা এসেছে এমন সময় হঠাৎ দেখল, একদল হাতি পাশের একটি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে রাজপথ ধরছে। এগুলো কিন্তু বুনো হাতি নয়। মাহুত বসে আছে সকলের পিঠে। পোষা হাতি।

তাই না দেখেই মউ ছুটে গিয়ে হাত দেখাল ওদের। তারপর হেঁকে বলল, "তোমরা কোথায় যাবে গো ? কতদূর ?" (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

খেলাধুলো

মনোজকে বদলে দিয়েছেন মুদাস্‌সার

এক সময়ের বাতিল খেলোয়াড় মনোজ প্রভাকর কীভাবে দলে ফিরে এলেন ? মনোজ সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য জানিয়েছেন মানস চক্রবর্তী

কিছুদিন আগেও ব্যাপারটা এরকম ছিল না। ভারতের বোলিং সম্পর্কে আলোচনা উঠলেই লোকে বলত একা কপিলদেব আর কত টানবেন ? পাশে তো কোনওদিনই সেভাবে কাউকে পেলেন না। ভারতের সর্বকালের সেরা অলরাউণ্ডার কপিল অবশ্য এখনও রয়েছেন এবং বহাল তবিয়তেই। তবু ভারতীয় বোলিং এখন আর তাঁর চওড়া কাঁধের ওপর ততটা নির্ভরশীল নয়, যতটা নির্ভরশীল ছোটখাটো চেহারার দিল্লির লড়াকু মনোজ প্রভাকরের ওপর। অথচ এই মনোজই একদিন ছিলেন অবাঞ্ছিত।

কলকাতায় রঞ্জি ফাইনাল খেলতে এসেছিল দিল্লি। বিরতির দিনে হোটেলের ঘরে এসব নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল মনোজের সঙ্গে। মাঠে তাঁর আচরণে যতই উগ্র মেজাজ প্রকাশ পাক না কেন, মাঠের বাইরে তিনি কিন্তু বেশ ভদ্র, চটপটে এবং হৃদয়বান। বলছিলেন, "সেসব অন্ধকার দিনের কথা ভাবলে এখনও কষ্ট হয়। সবাই আমার গায়ে একটা ছাপ মেরে দিল। বলল আমি নাকি পুরনো বলে বল করতে পারি না। শৈশব থেকেই আমি নিজেই খেলা শিখেছি। প্রথাগত শিক্ষা কারও কাছে তেমন পাইনি। এবার অনেককে জিজ্ঞেস করলাম। কেউ সাহায্য করল না। কপিলকে বললাম। ও বলল, 'আমি নিজেই জানি না তোমায় কী বলব।' শুনেছিলাম ইমরান-সরফরাজ পুরনো বলে ভাল সুইং করাতে পারে। বিশেষ করে সরফরাজ। দেখা হলে জানতেও চাইলাম। কিন্তু ওরা কোনও পাত্তাই দিল না। তখন আমি ইংল্যান্ডে লিগ খেলি। ওখানেই দেখা হল মুদাস্‌সার নজরের সঙ্গে। ওঁর কাছে সাহায্য চাওয়ায় উনি এগিয়ে এলেন। পুরনো বলে বোলিং করে মুদাস্‌সার বড়-বড় বহু পার্টনারশিপ ভেঙেছেন। ওঁকে বলা হত 'ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন আর্ম'। মুদাস্‌সার আমাকে শেখালেন পুরনো বলে সুইং করানোর জন্য কীভাবে বল 'গ্রিপ' করতে হয়। নেটে সেভাবেই বল করতে লাগলাম। তবু সন্দেহ ছিল। ফরিদাবাদে নিউজিল্যাণ্ড বনাম উত্তরাঞ্চলের খেলায় রিচার্ড হ্যাডলিকে নেটে বল করতে দেখলাম। লক্ষ করলাম পুরনো বলে উনি কীভাবে বল গ্রিপ করেন। দেখলাম মুদাস্‌সার যা বলেছেন হুবহু এক। বুঝে গেলাম আমি ঠিক পথেই চলেছি। বাকিটা আপনি জানেন।"

গড়গড় করে কথাগুলো বলে যাওয়ার পর দম নিতে মনোজ একটু থামতেই প্রশ্ন করলাম, "পাকিস্তানে আপনার সাফল্য দেখে কপিলদেবের মতো বোলারও বলেছেন কীভাবে পুরনো বলে সুইং করাতে হয় তার কায়দাটা আপনার কাছ থেকে শিখবেন। আপনি কি জানাবেন ওঁকে কায়দাটা ?" "না, না। শুধু কপিল কেন, কাউকেই আমি ওই কায়দা শেখাব না। এখন তো নয়ই।"

আপাতত ভারতীয় দলে যাঁর জায়গা নিয়ে কোনও সংশয় নেই, সেই মনোজ আগ্রহে তাকিয়ে আছেন ইংল্যাণ্ড সফরের দিকে। ইংল্যাণ্ড সফর ঘিরে তাঁর উৎসাহ শুধু এজন্যই নয় যে, সেখানকার আবহাওয়া সুইং বোলিংয়ের অনুকূল। এজন্যও যে, ১৯৮৬-র ইংল্যাণ্ড সফর চলার সময় তাঁকে দল থেকে অন্যায়ভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনা স্মরণ করে মনোজ বলেন, "প্রথম তিনটি কাউন্টি ম্যাচে আমি ১২টি উইকেট পেলাম, তবু হঠাৎই বলা হল আমাকে দিয়ে চলবে না। দরকার একজন অভিজ্ঞ বোলার। মদনলাল তখন ইংল্যাণ্ডে ক্লাব ক্রিকেট খেলছেন। আমার বদলে ওঁকে নেওয়া হল। এই অপমান আমি জীবনে ভুলব না। আবার সুযোগ আসছে ইংল্যাণ্ড সফরে। গুচ, ল্যাম্ব, লারকিনস কিংবা স্মিথ ভাল ব্যাটসম্যান হতে পারেন, কিন্তু বল যদি সুইং করাতে পারি বিশ্বের যে-কোনও ব্যাটসম্যানকে আমি কাঁপিয়ে দেব।" সুনীল গাওস্করের ভক্ত মনোজ। তিনি গাওস্করসহ বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বল করেছেন। তাঁর মতে, "ইমরানকে আউট করা খুব শক্ত। উনি

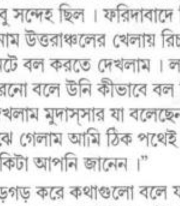

অতুল ওয়াসন

অতুল ওয়াসনের জায়গা আপাতত ভারতীয় দলে পাকা বলেই মনে হয়। তবে তাঁকে আরও ভাল বল করতে হবে। সে ক্ষমতা তাঁর আছে।

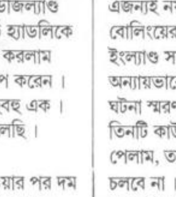

রাজীব শেঠ

এখনও টেস্ট-দলে আসেননি রাজীব শেঠ। তবে নজর কেড়েছেন। ভারতীয় দলে মিডিয়াম ফাস্ট বোলারের চাহিদা তিনি মেটাতে পারবেন।

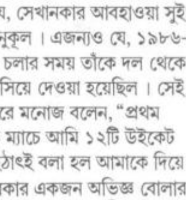

সঞ্জীব শর্মা

সঞ্জীব শর্মা আগেই ভারতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। কিন্তু সেরকম সাড়া জাগাতে পারেননি। তবে দিল্লি দলের তিনি বড় ভরসা।

ফোটো : উৎপল সরকার

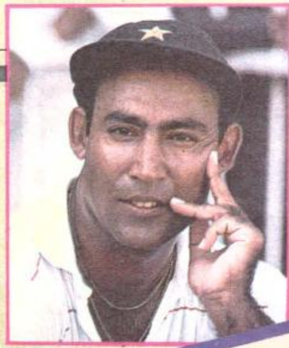

তখন আমি ইংল্যান্ডে লিগ খেলি। ওখানেই দেখা হল মুদাস্‌সার নজরের সঙ্গে। ওঁর কাছে সাহায্য চাওয়ায় উনি এগিয়ে এলেন। পুরনো বলে বোলিং করে মুদাস্‌সার বড়-বড় বহু পার্টনারশিপ ভেঙেছেন। ওঁকে বলা হয় 'ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন আর্ম'।

ভারতীয় দলের এখন প্রধান ভরসা মনোজের বোলিং

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

আগাগোড়া সোজা ব্যাটে খেলেন।" মনোজের লক্ষ্য নব্বই দশকের সেরা অলরাউণ্ডার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। রঞ্জি এবং দলিপে তাঁর ন'টি সেঞ্চুরি আছে। এর মধ্যে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি। রঞ্জিতে বহুবারই তিনি ইনিংসের গোড়াপত্তন করেছেন। একদিনের ম্যাচে ভারতের হয়ে ওপেন করে তাঁর সেঞ্চুরিও আছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জামশেদপুরে। টেস্টেও তিনি হয়তো সেঞ্চুরি পেতেন। নিউজিল্যাণ্ডে নেপিয়ার টেস্টে ব্যক্তিগত ৯৫ রানের মাথায় আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে তাঁর ইনিংসে যবনিকা পড়ে। এ-কথা উঠতেই মনোজ বলেন, "এখন পর্যন্ত ওটাই আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। শুধু সেঞ্চুরিটাই নয়, আম্পায়ারের বাজে সিদ্ধান্তে আমি অন্তত সাতটা উইকেট পাইনি। যে টেস্টে জোন্স সেঞ্চুরি করলেন, সেবার অন্তত পাঁচবার তিনিও আউট ছিলেন। এরকম অশিক্ষিত আম্পায়ার দুনিয়ায় কোথাও নেই। বলতে পারেন ঘরোয়া আম্পায়ারিং-এর জন্য নিউজিল্যাণ্ডে আমরা হেরে গেলাম।"

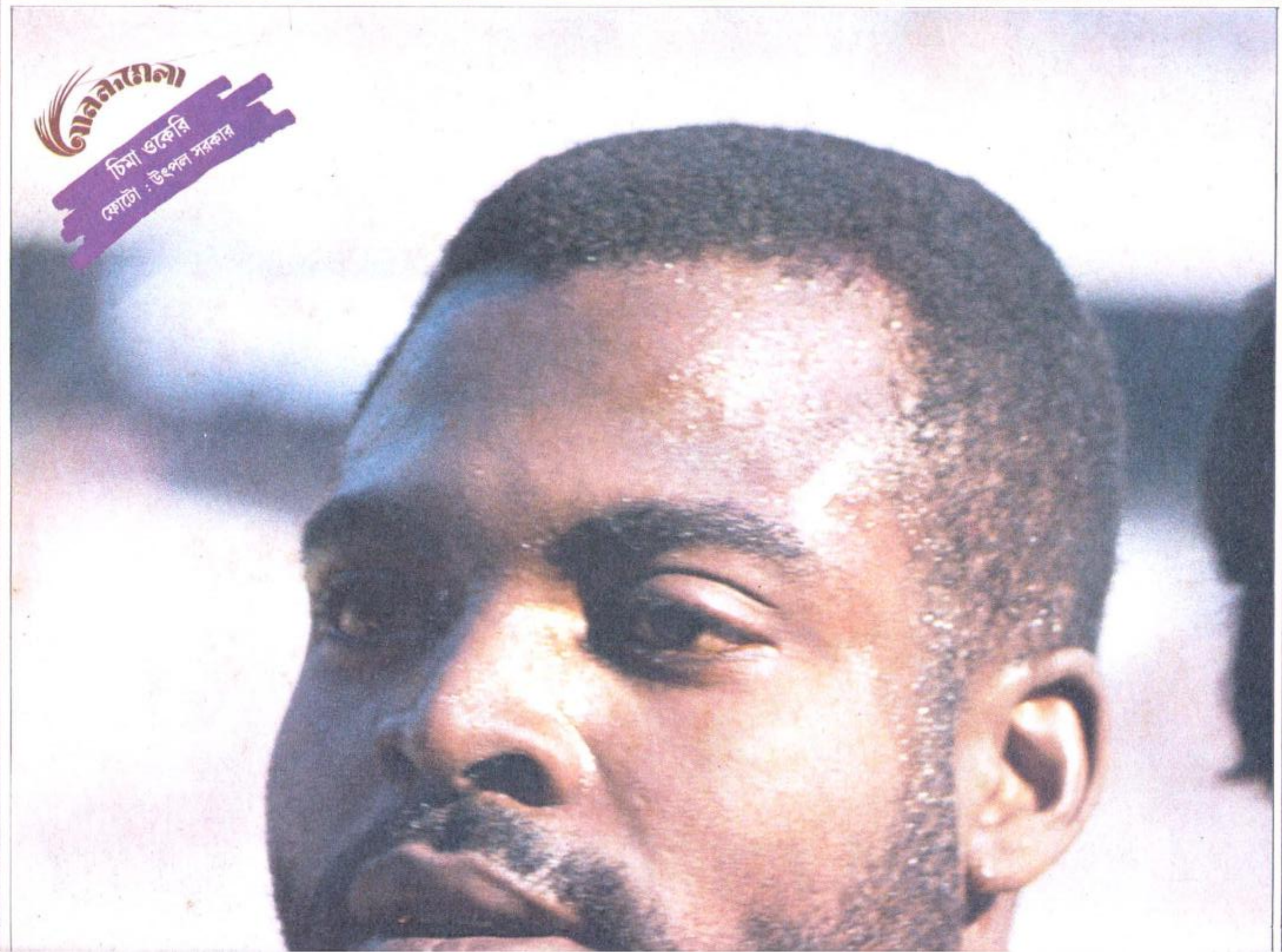
খেলামেলা
চিমা ওকেরি
ফোটো : উৎপল সরকার

মারাদোনার আর্জেন্টিনা কি এবারও বিশ্বকাপ জিততে পারবে

অনেকে বলছেন সম্ভাবনা কম, অনেকের মত মারাদোনা যখন আছেন তখন বিশ্বকাপ আবার তাঁরাই পাবেন । আলোচনা করেছেন **অনুপ সেন**

আগের বিশ্বকাপেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল । কার্লোস বিলার্দোর আর্জেন্টিনা দলকে তাঁর দেশের সমর্থকরা গুরুত্বই দেননি । বরং বলেছিলেন, "কী হবে মেক্সিকো গিয়ে, শুধু শুধু পয়সা খরচ ।" এবারের ঘটনাও প্রায় একই । পত্র-পত্রিকা লিখছে, গত তিনটি বিশ্বকাপের মধ্যে দু'বার জয়ী আর্জেন্টিনার এবার কোনও আশা নেই । শুরুর ঘটনায় মিল আছে, শেষেও কি

ডান দিকে, গতবারের বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা দল ; নীচে, মারাদোনার ম্যাজিক

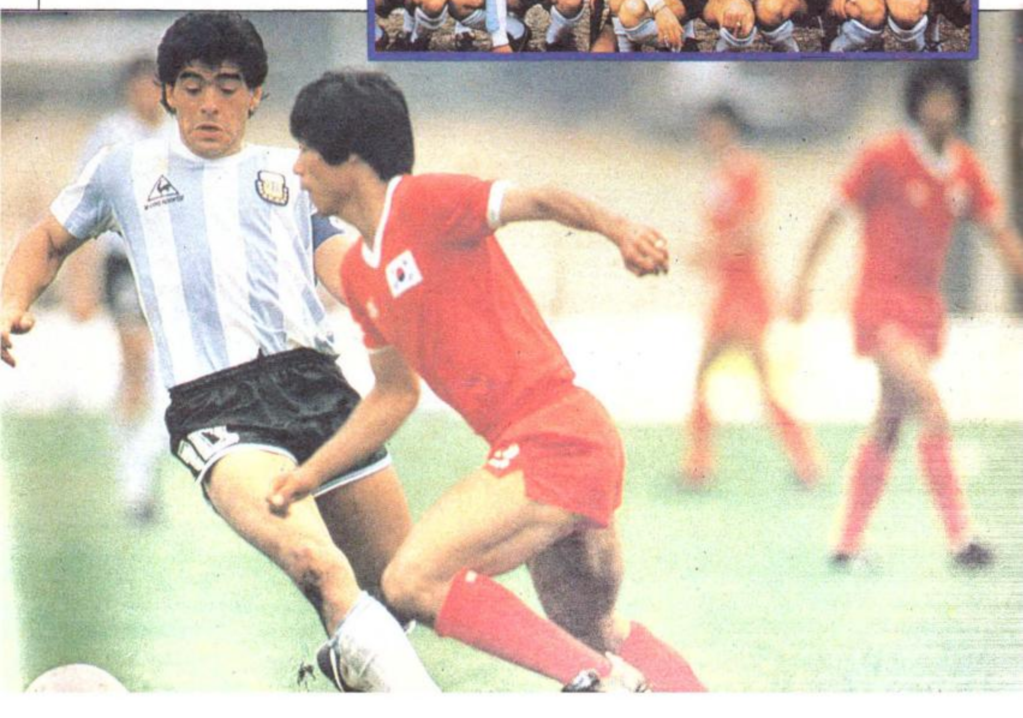

থাকবে ? আর্জেন্টিনার দলনায়ক মারাদোনার হাতে গতবারের মতো এবারেও কি দেখা যাবে বহু আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বকাপের ট্রোফিটি ? মেক্সিকো বিশ্বকাপের পর থেকে গত চার বছরে আর্জেন্টিনার ফুটবল দলটির খেলার ধারাবাহিক পর্যালোচনা করলে কিন্তু বলতেই হবে, অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয় । দলগত শক্তি চার বছরে এতটুকু বাড়েনি । সে তুলনায় হল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি এবং ব্রাজিল অনেক উন্নতি ঘটিয়েছে । কিন্তু আর্জেন্টিনায় নতুন প্রতিভা প্রায় একেবারেই উঠে আসেনি । তার ফলে আর্জেন্টিনার কোচ কার্লোস বিলার্দোকে নির্ভর করতে হচ্ছে ছিয়াশি সালের দলের অধিকাংশ ফুটবলারের ওপর । এবং তাঁদের বেশির ভাগেরই বয়স হয় তিরিশের ওপর, না হয় কাছাকাছি । দলের নিয়মিত খেলোয়াড়দের মধ্যে গোলরক্ষক নেরি পম্পিদুর বয়স ৩২ বছর, জুলিও ওলারতি কোয়েচেয়ার ৩১, এবং রিকার্ডো গিউস্তির ৩৩ বছর । এমনকী,৩৪ বছর বয়সী স্ট্রাইকার ইয়রগে ভালদানোকেও দলে ফিরিয়ে এনেছেন বিলার্দো । দু' বছর আগে খেলা ছেড়ে দেন ভালদানো । এই বয়সে এখন কি আর তাঁর পক্ষে ছিয়াশির বিশ্বকাপের মতো দুর্দান্ত উইং প্লে সম্ভব ? বিলার্দো অবশ্য নতুন দু-একজন তারকাকে পেয়েছেন । যেমন, স্ট্রাইকার ক্লদিও ক্যানিগ্নিয়া,গুস্তাফো দেজোত্তি এবং কার্লোস মোরিনো । এঁরা বেশ কিছু ম্যাচে দারুণ খেলে সমর্থকদের আশা জাগিয়ে তুলেছেন । বিলার্দোর আর এক ভরসা মিডফিল্ডার ইয়রগে বুরুচাগা । এই বুরুচাগাই মেক্সিকোতে ফাইনাল ম্যাচে জয়সূচক গোলটি করেন । গত বছর আর্জেন্টিনার আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার ফলও বেশ হতাশাব্যঞ্জক । ১১টি ম্যাচের মধ্যে জয় মাত্র ২টি । গোল করেছে ৫টি,কিন্তু হজম করতে হয়েছে ৮টি । শেষ আটটি ম্যাচে একটিও গোল করতে পারেনি তারা।

বিলার্দোর যুক্তি অবশ্য অন্যরকম । তিনি বলেছেন, "আমার টিম গোল পাচ্ছে না, তার কারণ বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই বিদেশে ক্লাবের খেলাতে ব্যস্ত থাকে । একসঙ্গে ট্রেনিংয়ের সুযোগ পাচ্ছে না । আমি সবাইকে পাচ্ছি ম্যাচের দু'একদিন আগে । তবে যেহেতু সবাই তৈরি, ৪৫ দিন সবাইকে একসঙ্গে পেলেই যথেষ্ট ।

এর সঙ্গে বিলার্দো আর-একটি কথাও বলেছেন । এবং সেটাই আসল কথা । "দিয়েগো মারাদোনাই আমার প্রধান অস্ত্র । তাঁর স্কিল অন্য টিমের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য গড়ে দেবে ।" অর্থাৎ, মারাদোনাই তুরুপের তাস,তাঁর পায়ের দিকেই তাকিয়ে আছে আর্জেন্টিনা ।

তেইশ বছরের স্ট্রাইকার ক্লদিও ক্যানিগ্নিয়া এবারে 'হিরো' হতে পারেন । খেলেছেন ১৯ টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ । খেলা শুরু করেন রিভার প্লেট ক্লাবে, এখন আছেন ভেরোনায় । 'কোপা আমেরিকা'-য় দুটি ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেন । স্পিড দারুণ, মুহূর্তে বিপক্ষ ডিফেন্স তছনছ করেন । হেডেও বেশ দক্ষ । ইতালির লিগে খুব নাম করেছেন । অনেকের ধারণা, ক্যানিগ্নিয়ার নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে ।

গতবারের আর্জেন্টিনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার কার্লোস মোরিনোর বয়স পঁচিশ । বাম প্রান্ত ধরে বল নিয়ে যখন দৌড়ন এই স্ট্রাইকার, বিপক্ষ দলে ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে । ন'টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলেছেন মোরিনো । ১৯৮৮-র ওলিম্পিক গেমস থেকেই তিনি সবার নজর কাড়েন । আর্জেন্টিনা দলের প্রথম এগারোজনের মধ্যে তাঁর স্থান বাঁধা । তিনি বড় ম্যাচে চমক দেখাবেন বলে বিলার্দোর ধারণা ।

মেক্সিকো বিশ্বকাপের পর থেকে গত চার বছরে আর্জেন্টিনার ফুটবল-দলটির খেলার ধারাবাহিক পর্যালোচনা করলে কিন্তু বলতেই হবে, অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয় । দলগত শক্তি এতটুকু বাড়েনি । সে তুলনায় হল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি এবং ব্রাজিল অনেক উন্নতি করেছে । কিন্তু আর্জেন্টিনায় নতুন প্রতিভা প্রায় একেবারেই উঠে আসেনি ।

প্রাথমিকভাবে একটি সুবিধেও পাবেন তিনি । গ্রুপ বি'র প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে খেলতে হবে ক্যামেরুনের সঙ্গে ইতালির মিলান শহরে । বাকি দুটি ম্যাচ সোভিয়েত ইউনিয়ন আর রুমানিয়ার সঙ্গে নেপলস্-এ । ওই শহরেই সারাবছর খেলেন মারাদোনা । সেখানকার দর্শকদের সমর্থন পাবেন তিনি । মিলানেও পাবেন । কারণ ইতালিতে ফুটবলারদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় তিনিই । সুতরাং বিলার্দোর দলের বাকি খেলোয়াড়দের দক্ষতা, মারাদোনার জাদু আর দর্শক সমর্থনের যোগাযোগ যদি হয়, এবারের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে কি কেউ জয় থেকে দূরে রাখতে পারবে ?

গ্রুপে আর্জেন্টিনার খেলা

৮ জুন : ক্যামেরুন ।

১৩ জুন : সোভিয়েত ইউনিয়ন ।

১৮ জুন : রুমানিয়া ।

বিশ্বকাপে চমক দেখাতে পারে আমেরিকা

দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর আমেরিকা আবার বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে । অঘটন ঘটানোর জন্য তারা কেমন প্রস্তুতি নিচ্ছে জানিয়েছেন **সন্দীপ বসু**

শুরু হয়েছিল ১৯৮৮ সালের ২৪ জুলাই । জামাইকার কিংসটনে । শেষ হল ষোলো মাস পর, ১৯৮৯ সালের ১৮ নভেম্বর । ত্রিনিদাদের পোর্ট অব স্পেনে । প্রবল উত্তেজনার মধ্যে আমেরিকা বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্যায়ে গেল ত্রিনিদাদ ও টোবাকোকে এক গোলে হারিয়ে । দীর্ঘ চার দশক পর আমেরিকা আবার মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেল ।

আমেরিকাকে এই মূল পর্বে তোলার বড় কৃতিত্ব কোচ বব গ্যান্সালার-এর । তাঁর বয়স এখন ৪৮, আমেরিকার জাতীয় দলের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার ছিলেন তিনি । ১৯৬৪ এবং ১৯৬৮ সালের ওলিম্পিক দলের অধিনায়কত্বও করেছেন । বব নিজে অবশ্য দলকে মূল পর্বে তুলেই খুশি নন । তাঁর কথায়, "ইতালিতে একটা দারুণ কিছু করতে পারলে খুশি হব । আমাদের কেউ হিসেবের মধ্যে ধরছে না । এটাই আমাদের সেরা অস্ত্র । হারলেও যখন কেউ দোষ দেবে না, তখন সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধা কোথায় ?"

গ্রুপ 'এ'-তে আমেরিকার সঙ্গে আছে অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া এবং ইতালি । আমেরিকার কোচের মতে, প্রথম দুটি দেশকে হারানো খুব একটা কঠিন নয় । ইতালির সঙ্গে অবশ্য মরণপণ লড়াই হবে । সেই কঠিন চ্যালেঞ্জ নিতে এখন তাঁর দলকে তৈরি করে নিচ্ছেন বব ।

গোলরক্ষক টনি মেওলা

বর্তমান আমেরিকার দলটির প্রধান শক্তি তারুণ্য । অধিকাংশ খেলোয়াড়ের বয়সের গড় ২৩ । সুতরাং লড়াইয়ে এঁরা এক পাও পিছিয়ে আসবেন না । দেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ এই তরুণেরা চেষ্টা করবেন অন্তত একটি ম্যাচেও অঘটন ঘটানোর । অবশ্য এই দলটির কিছু সমস্যা যে নেই, তা নয় । প্রথমত, অভিজ্ঞতার অভাব । যদিও কোয়ালিফাইং রাউন্ডে তাঁরা অনেক কিছু শিখেছেন,তবু 'বড়' ম্যাচে খেলার অভিজ্ঞতা হবে এই প্রথম । কোচ বব অবশ্য বলেন, "ইচ্ছে এবং ঝাঁপিয়ে পড়ার মনোবৃত্তি যদি থাকে কোনও বাধাই বাধা নয় । খেলতে খেলতেই অভিজ্ঞতা হয় । আমার ছেলেরা নিশ্চয় তা বুঝতে পারবে ।"

খেলা তৈরিতে দক্ষ জন হক্‌স

আমেরিকার দলটিতে কোনও 'স্টার' নেই । ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র টনি মেওলা এই বিশ্বকাপেই স্টার হতে পারেন । তাঁর বয়স মাত্র তেইশ । আগে খেলতেন বেসবল । বর্তমানে দেশের সেরা গোলরক্ষক । রিক ডেভিস এবং পল কুরুমপে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার । মাঝমাঠে আছেন জন হক্‌স এবং পল ক্যালিগয়রি । খেলা তৈরিতে দুজনেই দক্ষ । হক্‌স হেডে দক্ষ, ট্যাক্‌লও করেন দারুণ । ক্যালিগয়রি যে পাস বাড়ান তাতে যেন ঠিকানা লেখা থাকে । তাঁর বাড়ানো বল দলের স্ট্রাইকারের পায়ে পৌঁছে যায় । হুগো পেরেজ আক্রমণভাগে নেতৃত্ব দেন । গোল করায় দক্ষ । আমেরিকার দলটির মূল শক্তি কিন্তু দলগত লড়াইয়ের মনোবৃত্তি । এবং সেই মনোভাব নিয়েই তরুণ দলটি ইতালি যাবে । ১৯৯৪-এর বিশ্বকাপ হবে আমেরিকায় । এই তরুণেরা চাইবেনই তার আগে এমন কিছু একটা করতে, যাতে সকলেই তাঁদের মনে রাখে । আর হারার লজ্জা যেখানে নেই, সেখানে জয়ের চেষ্টা করবেন না কেন আমেরিকার তরুণরা ?

জাগুয়ার জোন্‌স

জাভেদ মিয়াঁদাদ, সেলিম মালিক, মার্টিন ক্রো, অ্যালান বর্ডার ও ডিন জোন্‌স—এখনকার ক্রিকেটে এঁরাই সবচেয়ে সফল ব্যাটসম্যান। এঁদের আউট করতে বোলাররা হিমসিম খেয়ে যান। ভিভ রিচার্ড্‌স যখন ফর্মে থাকেন, তখন তো কথাই নেই। কোনও বোলারকেই তিনি পাত্তা দেন না। তবে, বোলারদের পক্ষে সুখের কথা, রিচার্ডস তাঁর আগের ফর্ম হারিয়ে ফেলেছেন। মিয়াঁদাদও মাঝেমধ্যেই ভোগেন পিঠের ব্যথায়। তবু, মিয়াঁদাদকে আউট করা সত্যিই কঠিন। কিন্তু প্রশ্ন হল, মিয়াঁদাদ, মালিক, ক্রো, বর্ডার ও জোন্‌সের মধ্যে কাকে আউট করা সবচেয়ে কঠিন। উত্তরটা দিয়েছেন ভারতের সুইং বোলার মনোজ প্রভাকর। তিনি এই পাঁচ ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধেই বল

করেছেন। কার কোথায় দুর্বলতা, তা তাঁর বিলক্ষণ জানা আছে। মনোজ বলেছেন, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাটসম্যান হচ্ছেন ডিন জোন্‌স। কারণ, জোন্‌স প্রথম থেকেই বোলারদের আক্রমণ করেন। ওঁকে আউট করার চিন্তাটা বোলারদের থাকে না। বরং কী করে জোন্‌সকে শান্ত রাখা যায়, সেটাই হয়ে ওঠে তাঁদের চিন্তার বিষয়। মনোজ প্রভাকর সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আরও জানান, "জোন্‌সই যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাটসম্যান এ বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়।" ছিপছিপে চেহারার জোন্‌স অত্যন্ত চটপটে। তাঁর ফুটওয়ার্ক দেখার মতো। ফাস্ট ও স্পিন—দু' ধরনের বলই দুর্দান্ত খেলেন। সম্প্রতি রথম্যান্‌স ট্রোফিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলায় হ্যাডলির বলে অনায়াস ভঙ্গিতে তিনি যেভাবে দু' দুটো ওভারবাউন্ডারি মেরেছেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সেদিন হ্যাডলিও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। জোন্‌সকে এখন কেউ কেউ বলছেন 'জাগুয়ার জোন্‌স'। কথাটা মিথ্যে নয়।

কার্ল লিউইস

খেলাধুলোর জগতে এ বছরের বড় আকর্ষণ ইতালিতে বিশ্বকাপ ফুটবল ও বেজিং এশিয়াড। কিন্তু এমন একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে যা অ্যাথলেটিক্‌স দুনিয়ায় শোরগোল তুলবে। লং জাম্পে বব বিমেন-এর বিশ্বরেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করবেন কার্ল লিউইস। ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো সিটিতে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন বিমেন। সমালোচকরা বলেন, "সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেকটা উঁচুতে মেক্সিকো সিটি, তাই ওখানে লং জাম্পে হয়তো কিছুটা বাড়তি সুবিধে পেয়েছিলেন বিমেন।" বিগত দুটি ওলিম্পিকে লং জাম্পে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন লিউইস। মেক্সিকো সিটিতেও তাঁকে লং জাম্পের আমন্ত্রণ জানানো হয়। মেক্সিকো সিটির মতোই উচ্চতা আছে আরও দুটি শহরের। একটি আমেরিকার কলোরাডো স্প্রিংস এবং অন্যটি ইতালির সেসট্রিয়েরে। লিউইস হয়তো ইতালির এই জায়গাটিকেই বেছে নেবেন। লং

জাম্পে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ার জন্যই তিনি এ বছর বেশি প্রতিযোগিতায় নামবেন না। সারা বছরে মাত্র সাতটি থেকে ন'টি প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ নিতে পারেন।

ক্রিকেটারদের নামে রাস্তা

জনপ্রিয় খেলোয়াড়দের নিয়ে ডাকটিকিট বেরোয়, তাঁদের নামে শহরের রাস্তার নামও রাখা হয়। তবে রাস্তার নামকরণের ব্যাপারে সব শহরকে বোধ হয় টেক্কা দেবে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস-এর ছোট একটি শহর। উলনগং থেকে কিছুটা দক্ষিণে এই শহরতলির নাম ওয়ারিলা। এখানে অস্ট্রেলিয়ার ৩৪জন টেস্ট ক্রিকেটারের নামে রাস্তা আছে। স্বদেশের বিখ্যাত ক্রিকেটারদের এভাবে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন ওয়ারিলা শহরের মানুষ। বার্নস স্ট্রিট, জ্যাকসন স্ট্রিট, বুথ স্ট্রিট, বার্জ প্লেস, ফ্লিটউড ক্রিসেন্ট, ও'রিলি স্ট্রিট, বেনো ক্রিসেন্ট, স্পফোর্থ স্ট্রিট, গ্রিমেট স্ট্রিট, মরিস প্লেস, ও'নিল স্ট্রিট, ট্রাম্পার স্ট্রিট, ব্রাডম্যান অ্যাভেনিউ, জার্মান প্লেস, হ্যাসেট স্ট্রিট, হিল স্ট্রিট, ম্যাককেব স্ট্রিট, কিপাক্স স্ট্রিট, মার্টিন স্ট্রিট, টোসাক স্ট্রিট, ওয়াল স্ট্রিট (!), পনসফোর্ড স্ট্রিট, উডফুল স্ট্রিট, ডেভিডসন স্ট্রিট, লিন্ডওয়াল স্ট্রিট, গ্রেগরি স্ট্রিট, ওয়াল্টার্স স্ট্রিট, হার্ভে স্ট্রিট, ওল্ডফিল্ড স্ট্রিট, আর্মস্ট্রং স্ট্রিট, মেইলি প্লেস এবং ম্যাকে স্ট্রিট। কাছাকাছি জোন্‌স স্ট্রিট নামেও আর-একটি রাস্তা আছে। শহরের পথনির্দেশিকায় আর-একটি নামও পাওয়া যায়। ম্যাককুল স্ট্রিট।

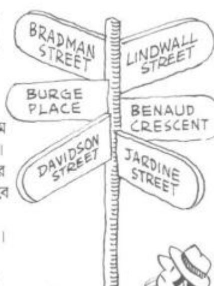

ছবি : দেবাশিস দেব

এই শহরতলির উত্তরে 'ফেয়ারি মিডো'-তে জন্মেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট-অধিনায়ক গ্রেগরি। এখানে আছে জার্ডিন স্ট্রিট, চ্যাপম্যান স্ট্রিট এবং ডগলাস রোড। নিউ সাউথ ওয়েলসের অস্টিনমার থেকে জি·ডি· স্টাটন নামে এক ক্রিকেটপ্রেমী 'উইজডেন' পত্রিকায় চিঠি লিখে এই তথ্য জানিয়েছেন।

আম্পায়ার

দীর্ঘদিন টেনিস খেলে-খেলে শেষপর্যন্ত কি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই জিমি কোনর্স? অবশ্য টেনিসকে কিছুতেই ছাড়ছেন না তিনি। সম্প্রতি টেনিস কোর্টে না থেকে কয়েক হাত দূরে বসে ছিলেন তিনি। যে-ভদ্রলোকটিকে খেলার সময় একেবারেই পছন্দ করতেন না, তাঁর ভূমিকাই পালন করলেন জিমি। 'নেবিস্কো সিনিয়ার মাস্টার্স' টুর্নামেন্টে আম্পায়ার হন এবং বেশ ভালভাবেই কাজ চালিয়ে নিলেন।

ব্যাটিং না করেই

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবিনা পার্কে ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে বেতারে ধারাবিবরণী দিচ্ছিলেন মাইকেল হোল্ডিং ও ডেভিড গাওয়ার। কিথ আর্থারটন ব্যাট করতে এলেন। তখন হোল্ডিং ও গাওয়ার দু'জনেই মন্তব্য করলেন, "ব্যাট করার আগেই ২০ রান করে ফেলেছেন আর্থারটন!" অর্থাৎ, ফিল্ডিংয়ে অন্তত ২০ রান তিনি বাঁচিয়েছেন। আর্থারটন প্রথম বলেই আউট হয়ে যান। স্কোরবোর্ডে অবশ্য তাঁর নামে শূন্য রানই থাকল।

ময়দানের লড়াই

পূর্ব প্রকাশিতের পর

সন্তোষ ট্রোফিতে নির্বাচিত বাংলা দলের ফুটবলারদের নিয়ে কয়েকদিন আগে আই· এফ· এ মাঠে প্র্যাকটিস করছিলাম। প্র্যাকটিস সবে শেষ হয়েছে, একটি ছেলে এসে পরের দিনের জন্য ছুটি চাইল আমার কাছে। বলল, "কিছু দরকারি কাজ আছে।" ছুটি মঞ্জুর করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে এও বললাম, অনুশীলন চলার সময় এ-ধরনের ছুটি যত কম নেওয়া যায়, ততই ভাল। ভাল খেলোয়াড় হতে গেলে প্র্যাকটিসের ওপর জোর দিতেই হবে। কোনও শর্টকাট নেই। সে আমার কথা কতটা শুনল জানি না, তবে শুনলে তার লাভই হবে।

লাভ কতখানি ? অনেকটা, তা মাপা যায় না। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমার সাফল্যের রহস্য কী ? আমি হেসে বলি, সাফল্য আমি তেমন কিছু পাইনি। তবু যেটুকু পেয়েছি তা একমাত্র অনুশীলনের জোরে। রহস্য-টহস্য কিচ্ছু নেই। মাঠে নেমে যেটা ভুল করেছি, পরের দিন প্র্যাকটিসে বারবার তা শুধরেছি। কোচেরা যা বলতেন, অক্ষরে-অক্ষরে তা পালনের চেষ্টা করতাম। সবসময় পারতাম না, কিন্তু হাল ছাড়িনি। মনে আছে, ইস্টবেঙ্গলে থাকার সময় কয়েক ঘণ্টা প্র্যাকটিসের পরও প্রদীপদা আমায় আলাদাভাবে অনুশীলন করাতেন। পা চলত না, হাত নাড়াতে পারতাম না, তবু চেষ্টা করেছি। আবার বলছি, কোচের সব নির্দেশ মানতে পারিনি। পারলে অনেক বড় খেলোয়াড় হতাম। কিন্তু কিছু নির্দেশ মেনেই আমার কত যে লাভ হয়েছে তার কোনও ঠিক নেই। চাকরি, নিরাপত্তা, সম্মান এবং সমর্থকদের ভালবাসা তো আছেই, সঙ্গে আরও কত উপরি পাওনা জুটে যায়। এই যে তোমাদের কাছে আমি আমার খেলোয়াড়-জীবনের কথা বলার সুযোগ পেলাম, তা তো অল্প-স্বল্প ফুটবল খেলেছি বলেই পেলাম ! ক'জনের এই সৌভাগ্য হয় বলো ? তাই আমার লেখা শেষ করার আগে তোমাদের আর একবার বলছি, ভাল ফুটবলার হতে গেলে ইচ্ছে ও দক্ষতা তো দরকারই, কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অনুশীলন। প্র্যাকটিসে একেবারে ডুবে যাওয়া উচিত। আমার কথাটা মানো, দেখবে তোমাদের আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না। একজন বিখ্যাত কোচ দারুণ একটা কথা বলেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ভাল ফুটবলার হতে গেলে কী-কী দরকার তার একটা তালিকা দিন। তিনি বলেছিলেন, পাঁচটা জিনিস দরকার। এক নম্বর অনুশীলন, দু' নম্বর অনুশীলন, তিন নম্বর অনুশীলন, চার নম্বর অনুশীলন এবং পাঁচ নম্বরও সেই অনুশীলন। আমিও একই কথা বলি।

আজ মনে পড়ছে সত্তরের দশকের উত্তেজনাময় দিনগুলোর কথা

গৌতম সরকার

ফুটবল খেলার দৌলতে আমি কত গুণীজনের সংস্পর্শে এসেছি। এঁরা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমারই সঙ্গে কথা বলছেন, এ আমি কখনও কল্পনাও করতে পারিনি। গত বিশ্বকাপে মেক্সিকো গেছি, ফেরার পথে এয়ারপোর্টে দেখি আমার স্বপ্নের ফুটবলার ববি চার্লটন দাঁড়িয়ে আছেন। ফুটবল মাঠে অনেক কঠিন পরিস্থিতির সামনে পড়েছি, তা অতিক্রমও করে গেছি। কিন্তু চার্লটনকে দেখে কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। নিজে গিয়ে কথা বলব, না দৃষ্টি সার্থক করেই চলে যাব? কথা বলতে গেলে যদি আমল না দেন? ভয় হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হল, গিয়ে কথাই বলি। ছোট মানের হলেও আমি তো ফুটবলার।

আর উনিও ফুটবলার। পাত্তা দেবেন না কেন? কাছে গিয়ে তাই সাহস করে বললাম, আমি ফুটবলার। এসেছি ইন্ডিয়া থেকে। আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। চার্লটন তাঁর লম্বা হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরলেন। ভারত নামটা শুনে দারুণ খুশি। বললেন, "গান্ধীর দেশ, না?" তারপর কত গল্প। আমাকে নিজের ছবি উপহার দিলেন। জিজ্ঞেস করলাম,"আর্জেন্টিনা তো এবার বিশ্বকাপ জিতল, কিন্তু আপনার প্রিয় দল কোনটি?" চার্লটন একটু ভেবে বললেন, "ব্রাজিল। সত্যি কথা বলতে কী জানো, ফুটবল বলতেই আমার পেলে, গ্যারিঞ্চার কথা মনে পড়ে। তাই ব্রাজিল ছাড়া আর কোনও দল কি প্রিয় হতে পারে?" মিনিট পনেরো কথা বললেন চার্লটন, মনে হচ্ছিল যেন পনেরো ঘণ্টা।

ববি মুরের সঙ্গে আমি

> **এই যে তোমাদের কাছে আমি আমার খেলোয়াড় জীবনের কথা বলার সুযোগ পেলাম, তা তো অল্প স্বল্প ফুটবল খেলেছি বলেই পেলাম। ভাল ফুটবলার হতে গেলে ইচ্ছে ও দক্ষতা তো দরকারই, কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অনুশীলন।**

একটা বিরাট ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার। একজন ফোটোগ্রাফার ডাকিয়ে এনে যদি ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে একটা ছবি তুলতে পারতাম—তা হলে কী ভালই না হত। সবাই ছবিটা দেখত আর গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠত। কিন্তু ঠিক সময়ে কেন যে বুদ্ধিটা মাথায় আসে না, কে জানে!

এই ছবি তোলার ব্যাপারে আর একজনের ক্ষেত্রে ভুল করিনি। ১৯৮৫ সালে কলকাতায় এসেছিলেন আর-এক বিশ্বখ্যাত ফুটবলার ববি মুর। নিজে গিয়ে আলাপ করেছিলাম। তবে ফোটোটা অবশ্য আমি তোলাইনি। ববি মুরই আমাকে পাশে দাঁড় করিয়ে এক ফোটোগ্রাফারকে বললেন, ছবি তুলে দিতে। সেই ছবি এখনও আমার কাছে পরম সম্পদ হয়ে আছে। ববি মুরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি কতক্ষণ প্র্যাকটিস করতেন?" ববি মুরের কথাটা এখনও আমার মনে আছে." প্র্যাকটিসের কোনও সময় আছে নাকি? যখন মনে হত তখনই বল নিয়ে খেলতে শুরু করতাম। কখনও-কখনও ঘরেও খেলেছি, ভোররাতে হয়তো মনে হয়েছে, ট্র্যাপিংটা ঠিকমতো পারছি না। ট্র্যাকস্যুট পরে নেমে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে।" শুনে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম, ভাবি সাধে কি আর ববি মুরের নামের পাশে বিশ্বসেরা শব্দটা যুক্ত হয়েছে।

ফুটবলের বাইরে অন্য জগতের যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্য এবং ভালবাসা পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে শচীন দেববর্মনের কথা। শচীনকর্তার সুমধুর কণ্ঠ এবং তাঁর গানের কথা সবাই জানে, কিন্তু ক'জন জানে তাঁর প্রবল ফুটবলপ্রেমের কথা? শচীনদা প্রবল ইস্টবেঙ্গল সমর্থক ছিলেন, কিন্তু বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপ খেলতে কলকাতার যে-দলই যাক না কেন, শচীনকর্তার কাছ থেকে দারুণ আতিথেয়তা পেত তারা।

বাংলাদেশে খেলতে যাই তিয়াত্তর সালে। 'স্বপ্নের নায়ক' মুজিবর রহমান তাঁর বাড়িতে নৈশভোজে বলেন, 'এই হাইট লইয়া এত তেজী ফুটবল খ্যালো কী কইরা?'

আজ এসব কথা লিখতে গিয়ে মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠছে। কত বিখ্যাত ব্যক্তি আমাকে ডেকে কথা বলেছেন, স্নেহ করেছেন। ওঁরা কত মহৎ, তা না হলে আমার মতো অখ্যাত ব্যক্তি শচীন দেববর্মণ, মুজিবর রহমানের ভালবাসা পায়? কোথায় ওঁরা আর কোথায় আমি। মনে মনে ভাবি, ভাগ্যিস ফুটবল খেলাটা শিখেছিলাম। ফুটবলই আমাকে ওঁদের এত কাছে এনে দিয়েছিল। আজ আমি বাংলা দলের কোচ হয়েছি, সারা বাংলা আমার এবং আমার ছেলেদের দিকে তাকিয়ে আছে। এই যে দায়িত্ব এবং ভালবাসা তা তো একটু-আধটু ফুটবল খেলেছিলাম বলেই পেয়েছি। তাই মনে হয়, আমি কত ভাগ্যবান! আঘাত, বঞ্চনা, অপমান সব ভেসে যায় এইসব সম্মান, স্নেহ, ভালবাসার কাছে। পুজোআচ্চায় আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু আগে মাঠে নামার সময় যেমন ফুটবলটা হাতে নিয়ে কপালে ঠেকাতাম, তেমনই আজও মনে-মনে হাতে নিয়ে কপালে ঠেকাই, প্রণাম করি।

(সমাপ্ত)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

খেলাধুলো ■ শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

কনুই দিয়ে আঘাত করার আর-একটি কৌশল

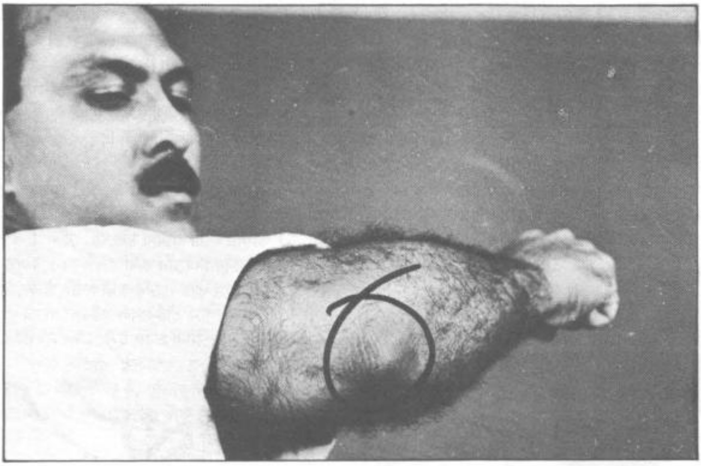

এর আগে আমি কিওকুশিন ক্যারাটের কনুই দিয়ে মারার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছি। এবারও আমি কনুই দিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার আর-একরকম কৌশল নিয়ে আলোচনা করব। প্রতিপক্ষ যদি সামনে, পিছনে বা পাশে কাছাকাছি থাকে তা হলে কনুই দিয়ে বিভিন্নরকম পদ্ধতিতে প্রতিপক্ষকে খুব সহজে আঘাত করে কাবু করে ফেলা যায়। সঠিক পদ্ধতি জানা থাকলে কনুই দিয়ে আঘাত বা 'হিজিউচি' খুবই জোরালো হতে পারে। আর-একটি কথা আমি আগেই আলোচনা করেছি যে, হাত কনুই থেকে মুড়ে দিলে যে অবস্থা তৈরি হয় তাতে সামনের দিক দিয়ে দু'ভাবে এবং পেছন দিক দিয়ে দু'ভাবে কনুই দিয়ে আঘাত করা যেতে পারে। গত সংখ্যায় ছবিতে কনুইয়ের সামনের দিকে আলাদা লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে। এই সংখ্যায় ছবিতে দেখানো হয়েছে কনুইয়ের পেছন দিকে কোন অংশ দিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে আঘাত করা যায়। এবারের সংখ্যায় কনুই দিয়ে মারার যে পদ্ধতি নিয়ে আমি আলোচনা করব তার জাপানি নাম 'হিজি উশিরো এতে'।

হিজি উশিরো এতে : 'হিজি' কথার অর্থ আগেই বলেছি, 'উশিরো' কথার অর্থ পেছনে, 'এতে' কথার অর্থ আঘাত করা। সাধারণত প্রতিপক্ষ পেছনে থাকলে তার সোলার প্ল্যাকসাস্ লক্ষ্য করে আঘাত করা যেতে পারে। আগেই বলেছি হাতের সাহায্যে মারার কৌশল বা মার আটকানোর কৌশল কিওকুশিন ক্যারাটেতে সাধারণত সানচিন-দাচি থেকে অনুশীলন করা হয়। এবারে যে-কৌশলটি নিয়ে আলোচনা করছি, সেটিও সানচিন দাচি থেকে অনুশীলন করতে হবে, শুরুতে ইওইদাচি তারপর ঠিকমতো সানচিন দাচিতে দাঁড়াতে হবে। দু' হাতের মুঠো শক্ত করে দু' দিকে পাঁজরে (ডান মুঠো ডান পাঁজরে, বাঁ মুঠো বাঁ পাঁজরে) স্পর্শ করে রাখতে হবে। এর পর প্রথমে ডান হাতের চেটো দিয়ে বাঁ মুঠোর সামনে স্পর্শ করে বাঁ দিকে তাকাতে হবে, এবার ডান হাতের চেটো দিয়ে বাঁ মুঠো স্পর্শ করা অবস্থায় বাঁ হাতটাকে কনুই থেকে সোজা করে বাঁ মুঠোকে সামনের দিকে যতটা সোজা করা যায় (কিন্তু বাঁ কনুই একটু মোড়া থাকবে) ততটা এগিয়ে নিয়ে ডান হাতের সাহায্যে বাঁ কনুইটাকে পেছনে ছুঁড়ে দিতে হবে (কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে)। এই অবস্থায় কোমর থেকে শরীরের ওপরভাগ বাঁদিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরে যাবে। শুরুতে বাঁ মুঠো ওপর দিকে করা ছিল কিন্তু অনুশীলনের সময় বাঁ মুঠোর আঙুলের ভাগ নিজের শরীরের দিকে ঘুরে যাবে। এবার বাঁ হাত দিয়ে আঘাত করলে দুটো হাত আবার সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে ডান হাত মুঠো হয়ে যাবে। বাঁ হাতের চেটো ডান মুঠো সামনের দিক স্পর্শ করে ঠিকভাবে তৈরি হয়ে নিয়ে ডান হাত কনুই থেকে মুড়ে পেছনে ছুঁড়তে হবে। এই অবস্থায় শরীরের ওপর ভাগ কোমর থেকে ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরে যাবে। এইভাবে একবার বাঁ হাত আবার ডান হাত—প্রতি হাতে কুড়িবার করে প্রথমে আস্তে-আস্তে তারপর অভ্যস্ত হলে তাড়াতাড়ি অনুশীলন করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতি হাতের কনুই পেছনে ঠিক সোজাভাবে গিয়ে আঘাত করে।

ফোটো : উৎপল সরকার

তিনটি আহত খেলোয়াড়ের জায়গায় রয় যে-নতুন প্রতিভার খোঁজ করছিল তাদের মধ্যে ছিল অ্যান্ডি লক। রয় তাকে পরখ করতে মেলচেস্টার মাঠে ডেকেছিল। কিন্তু সেখানে কিছু উচ্ছল শিক্ষানবিশ তাকে অটোগ্রাফশিকারি বলে ভুল করে এবং···
উহ্ ! আমাকে ছেড়ে দাও···
রবার্টসন··· জেনিংস্ ! এসব কী হচ্ছে ?
কী,বস্ !
রোভার্সের রয়
ছেলেটার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করছিলাম। কিন্তু ও খেপে গেল !
তাই তোমরা জবরদস্তি ওর মাথায় ঠাট্টা ঢোকাচ্ছ, তাই না ?
কিন্তু আমি এর মধ্যে ঠাট্টার কিছু খুঁজে পাচ্ছি না··· বিশেষ করে যখন আমার অনুরোধে ও এখানে এসেছে !
অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ ?
উউফ্ !
অ্যান্ডি লক রেগে লাফিয়ে উঠল !
তবে রে, যত্তসব হতচ্ছাড়ার··· !
ঠিক আছে, অ্যান্ডি, এবার থামো !
আর তোমরা সবাই ভাগো ! পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাই হেড গ্রাউন্ডসম্যানের সঙ্গে দেখা করো !
আচ্ছা, বস্··· যাচ্ছি !
অ্যান্ডি, এবার শোনো··· শুরুটা খুব আশাপ্রদ এমন বলতে পারছি না !
ওদের···ওদের আমাকে ঠাট্টা করা উচিত হয়নি ! আমাকে ওদের অটোগ্রাফ বিক্রির আজেবাজে কথা··· !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

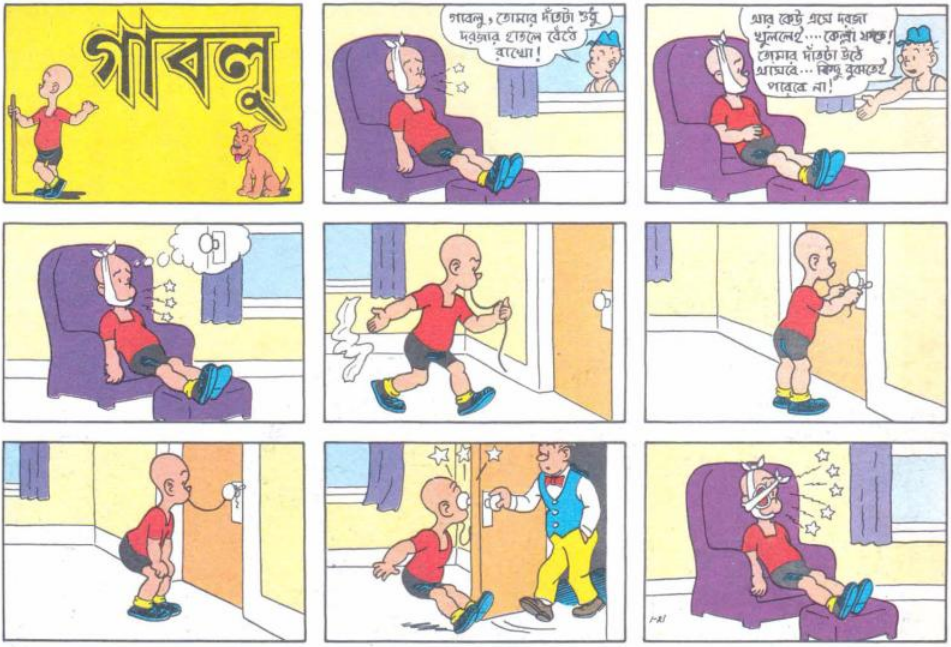
গাবলু
গাবলু, তোমার দাঁতটা শুধু দরজার হাতলে বেঁধে রাখো!
আর কেউ এসে দরজা খুললেই.... কেল্লা ফতে! তোমার দাঁতটা উঠে আসবে... কিন্তু বুঝতেই পারবে না!

গাবলু
প্রথম চাল আমার
এবার তোমার চাল, গাবলু
আমার চাল?
বাব্বা! গেমটা অনেকক্ষণ চলল!
12-31

(প্রথমাংশ)

সম্পূর্ণ উপন্যাস

টিকারা দামামা

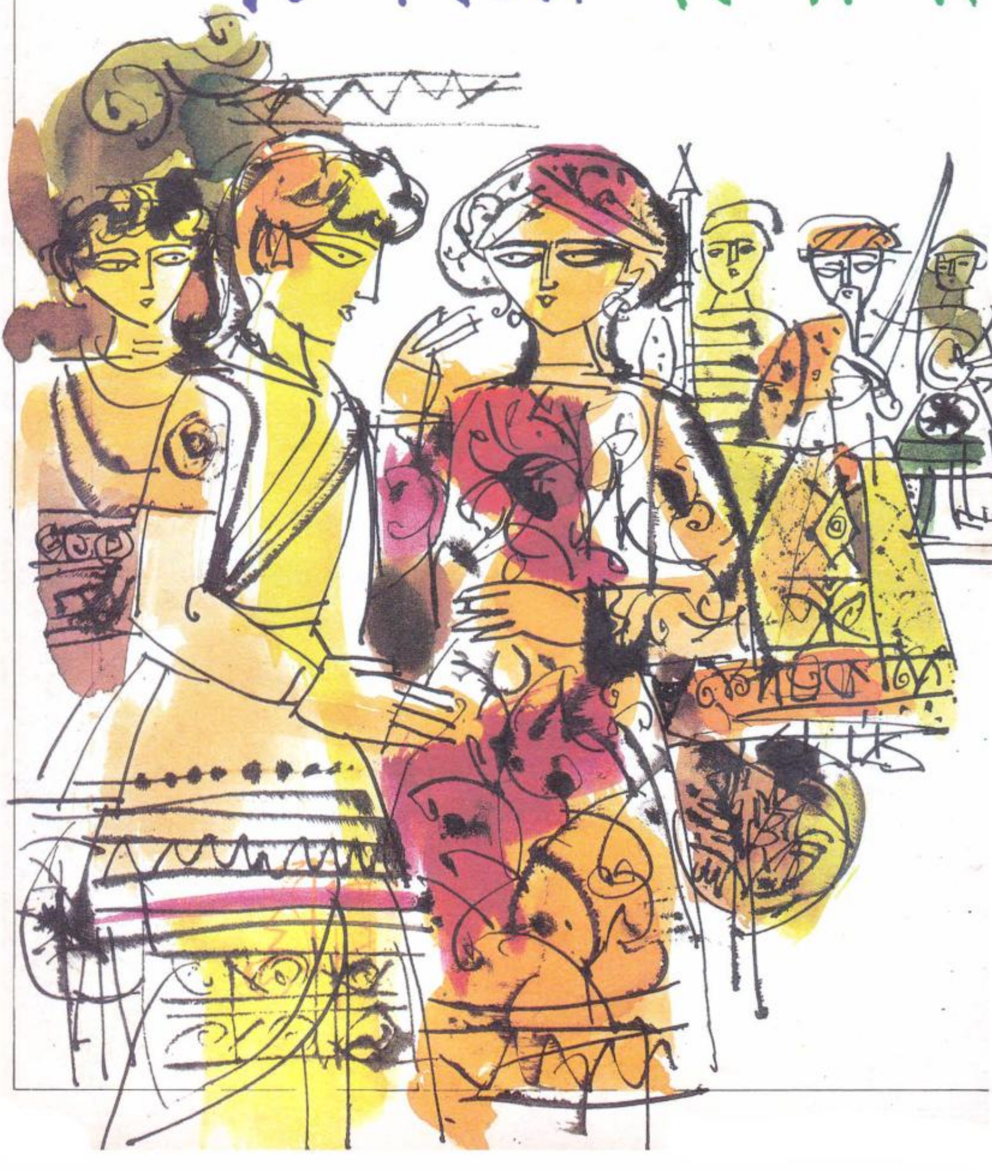

বাজে

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের জন্ম ১৯১০ সালের ১০ জানুয়ারি, ঢাকার মানিকগঞ্জ মহকুমার তেওতা গ্রামে। সাবিত্রী দেবী ও অতুলচন্দ্র গুপ্তের পুত্র প্রতুলচন্দ্র লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ থেকে পিএইচ ডি হন ১৯৩৬ সালে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক প্রতুলচন্দ্র কর্মব্যস্ততার মধ্যেও 'আনন্দমেলা'-র জন্য লিখেছেন নানা ধরনের গল্প। ঐতিহাসিক উপন্যাস 'টিকারা দামামা বাজে' যখন লেখেন, তখন কেউ ভাবতেও পারেননি, মাত্র কয়েক মাস পরেই, ১১ মার্চ, ১৯৯০, তিনি চিরবিদায় নেবেন।

বর্ধমান জেলার মানকর। আড়াইশো বছর আগেকার বেশ বড় গ্রাম, অনেক লোকের বাস। মানকর থেকে আরও ছ' ক্রোশ পশ্চিমে তুলসীঘাট। তুলসীঘাট গ্রামের জমিদার রমাপ্রসন্ন, ব্রাহ্মণ। একসময় অবস্থা বেশ ভাল ছিল। রমাপ্রসন্নর পিতা হরিপ্রসন্নর হাতি পোষার শখ ছিল, গ্রামের বাইরে এখন সেই পিলখানা ধসে পড়েছে। একটি হাতিও অবশিষ্ট নেই। এক পুরুষে রমাপ্রসন্নর অবস্থা পড়ে গিয়েছে। এরকম হল কী করে? তার কারণ শরিকদের সঙ্গে গোলমাল। রমাপ্রসন্ন নিজে খুব অলস লোক, মনে হয় কিছুতে তাঁর উৎসাহ নেই। এতদিন তো গৌর ছোট ছিল, তার কথাই ওঠে না। এখন ভাত-কাপড়ের জন্য রমাপ্রসন্নর কোনও কষ্ট হয় না। কিন্তু আগেকার কথা মনে পড়লে মন খারাপ হয়ে যায়। এক সকালবেলা রমাপ্রসন্ন অন্দর-বাড়ি থেকে আস্তে-আস্তে সামনে বাড়ির দাওয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। একটু চেঁচিয়ে ডাকলেন, "কই, তোমাদের হল?"

ভেতর থেকে রমাপ্রসন্নর গৃহিণী বললেন, "আসছি, আসছি।" প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে মৃন্ময়ীদেবী একজন উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলেকে নিয়ে উঠোনে এলেন।

মৃন্ময়ীদেবী বললেন, "এত তাড়া কিসের? এই তো সবে রাত পোহাল।" এই বলে ছেলে গৌরপ্রসন্নকে নিয়ে ডান দিকে গেলেন, বললেন, "যাত্রা করতে একটু সময় লাগবে না।" সেদিকে শ্রীধরের মন্দির, এঁদের গৃহদেবতা। মন্দিরের পিছনের দিকের অবস্থা ভাল নয়, কোনওদিন পড়ে যাবে। গৌর মন্দিরে ঢুকে প্রণাম করল। মৃন্ময়ীদেবী তার মাথায় প্রণামীর ফুল ছুঁইয়ে দিয়ে বললেন, "এটা সঙ্গে রাখো। রাস্তাঘাটে বলা তো যায় না, কত বিপদ আছে।" তারপর নিজের আঁচলের খুঁট থেকে একটা ছোট গয়না বার করে গৌরের হাতে দিয়ে বললেন, "এটাও রাখো, পিসির কাছে যাচ্ছ, খালি হাতে যেও না। এটা আমার শাশুড়ির নাকের বেসর। এইটে রেখে দাও, দরকার হতে পারে। রাস্তাঘাটে কাউকে এ-জিনিস দেখিও না। বলা তো যায় না, কার মনে কী আছে।" এই বলে বললেন, "এইবার এসো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

তাঁরা দু'জন বাইরে এসে দেখলেন রমাপ্রসন্নর পাশে নিত্যানন্দ চৌধুরী বসে আছেন। নিত্যানন্দ পাশের বাড়িতে থাকেন, এঁদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তিনি গৌরপ্রসন্নকে দেখে হাসিমুখে বললেন, "কী দাদা, অত সেজেছ কেন, কদ্দূর যাওয়া হচ্ছে?"

মৃন্ময়ীদেবী মাথার কাপড় একটু টেনে দিয়ে বললেন, "বেশি দূরে যাচ্ছে না, পিসিমার বাড়ি। ওর পিসেমশাই তো অনেকদিন ভুগে উঠলেন, এখন একটু সেরে উঠেছেন। বর্ষার সময় যাওয়ার সুবিধে ছিল না, এবার একবার দেখে আসুক, না গেলে ভাল দেখায় না!"

নিত্যানন্দ বললেন, "তা বেশ বউঠান। আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে দেখা না হলে কি আর সদ্ভাব থাকে। দেখো বাবা, সাবধানে যেও। কীসব লুটপাট করতে দল বেঁধে অন্য দেশ থেকে লোক এসেছে, তাদের নাকি বর্গি বলে। দেখো, যেন তাদের সামনে পোড়ো না।"

গৌর হেসে বলল, "সাবধানেই যাব।" তারপর মা-বাবাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, নিত্যানন্দকে নিচু হয়ে প্রণাম করল।

তিনি বললেন, "থাক, থাক, হয়েছে হয়েছে।" আবার বললেন, "সাবধানে যেও।" যদিও এখন বৈশাখ মাস, কিন্তু ততটা গরম পড়েনি। দু-একদিন আগে খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আকাশে এখনও অল্প-অল্প মেঘ, রোদ্দুরের তেজও কম। পারলে দুপুরবেলায় কোনও গাছের ছায়ায় ঘণ্টা-দুয়েক বিশ্রাম করো, অনর্থক রোদ্দুর লাগাবার দরকার নেই। যাদের নাম করলাম একটু আগে তাদের ধারে-কাছে যেও না, বুঝলে।"

"গৌর আবার হেসে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নিত্যানন্দ বললেন, "আর দেরি কোরো না, বেলা বেড়ে যাচ্ছে, এর পর পথ চলতে রোদে কষ্ট পাবে।"

দূরে দাঁড়িয়ে একটা শ্যামলা রঙের গোরু অবাক হয়ে এ-দৃশ্য দেখছিল। গৌরপ্রসন্ন বাড়ি থেকে বেরোবার আগে তার গায়ে হাত দিয়ে আদর করল। তাকে যেমন বলা হয়েছিল সেও তেমনই গোরুটাকে বলল, "ভাল হয়ে থাকিস।"

তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। দেওয়ালের গায়ে একটি স্থলপদ্মের গাছ, আর-একটা কামিনী ফুলের। বেশ বড় হয়েছে। স্থলপদ্ম গাছের ধার দিয়ে ফটক পেরিয়ে সে বড় রাস্তায় পড়ল। ফটকের বাইরে দুটো কৃষ্ণচূড়ার গাছ, তাদের বয়স হয়েছে, তবু ফুলে লাল হয়ে আছে। তার তলা দিয়ে হেঁটে বড় রাস্তায় উঠল। গৌর ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে, নৌকোয় করে এখানে এসে নামা যেত, সেইজন্য 'তুলসীঘাট' নাম। এখন সে নদী দূরে সরে গিয়েছে, প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে। তবে বর্ষার সময় কিছু জল থাকে, তখন নৌকোয় বাড়ি আসা যায়। কিন্তু নৌকো থেকে নেমে ক্রোশ তিনেক হাঁটতে হয়।

গৌরপ্রসন্ন পুব দিকে তাকিয়ে দেখল সূর্য হাতখানেক উঠেছে। সে হাঁটতে লাগল। হিসেব করে দেখেছিল তার পিসির বাড়ি পিরগাছা পৌঁছতে দেড়দিন লাগবে। পরদিন বিকেলে না হোক, সন্ধের দিকে পৌঁছে যাবে। একটা রাত রাস্তায় কাটাতে হবে, এ ছাড়া আর উপায় নেই। চার ক্রোশ আন্দাজ চলার পর তার ক্লান্তি বোধ হতে লাগল। রাস্তা থেকে একটু দূরে বড় জাম গাছের তলায় বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল। পাশে পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে এসে খাবারের জন্য হাতের পুঁটলি খুলল। তার মধ্যে কিছু মুড়কি, চারটে মণ্ডা, বাতাসা, শশা ও দুটি পেয়ারা। সে প্রথমে দুটি বাতাসা দিয়ে একঘটি জল খেল। তারপর শশা খেয়ে মুড়কি চিবোতে আরম্ভ করল। মুড়কি খাওয়া শেষ হলে একটা মণ্ডা মুখে দিয়ে আবার একঘটি জল খেল। তারপর পুঁটলি বেঁধে ফেলল। গৌরপ্রসন্ন ভাবলে, খাওয়া তো বেশ হল, এবার একটু জিরিয়ে নিতে পারলে হয়। জিরোবে কি জিরোবে না ভাবছে, এমন সময় দেখল, রাস্তা দিয়ে কয়েকজন লোক ছুটতে-ছুটতে যাচ্ছে। রোদের মধ্যে লোকগুলো ছুটছে কেন! এত রোদে কেউ কখনও ছোটে? গৌর নিজে শুয়ে একটু জিরোবার চেষ্টা করল। এমন সময় দেখল, শুধু চারজন নয় আরও অনেক লোক তাদের পিছনে ছুটতে-ছুটতে আসছে। তারপর দেখল শুধু লোক নয়, কেউ-কেউ তাদের পোষা জন্তু-জানোয়ার নিয়ে দৌড়চ্ছে। ব্যবসায়ীরা দৌড়চ্ছে। ব্যবসায়ী বলে বোঝা গেল, তাদের হাতে নিক্তি রয়েছে। কয়েকজন গ্রামের মেয়ে, একজনের হাতে দড়িবাঁধা ছাগল। সে উলটো দিকে মুখ করে ব্যা-ব্যা করে চেঁচাচ্ছে। তারপরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ মনে হল, তাদের পিঠে পুঁথির ভার। গৌরপ্রসন্ন তখন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর দেখল, দু'জন রাজপুত, তাদের সিপাই বলে মনে হল, তাদের হাতে তরোয়াল রয়েছে, তারাও একমুহূর্ত দাঁড়াচ্ছে না। গৌর ভাবল, এখন কী করবে? সেও কি ছুটবে না কি? কিন্তু কিসের জন্য? আর রাজপুতরাই বা তরোয়াল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে কেন? এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে তার চেয়ে বয়সে কিছু বড় একজন লোক, বোধ হয় অনেকক্ষণ ছুটেছে, তার রং ফর্সা নয়, কিন্তু রোদে লাল হয়ে গেছে, পুকুরের ধারে গিয়ে বসে নিচু হয়ে জল খেতে লাগল।

গৌর কাছে গিয়ে বলল, "ওরকম করে জল খাবেন না, আগে একটু বাতাসা মুখে দিন।"

লোকটি অবাক হয়ে গৌরের দিকে তাকাল, মনে হল আগে তাকে দেখতে পায়নি। বাতাসা নেওয়ার আগে লোকটি বলল, "মশাই?"

গৌর বলল, "আমরা ব্রাহ্মণ। আপনার নাম?"

লোকটি বলল, "আমার নাম গঙ্গারাম, আমি কায়স্থ, উপাধি দত্ত।"

আর- একঘটি জল খাওয়ার পর গৌর জিজ্ঞেস করল, "আপনার কী করা হয় ?"

লোকটি বলল, "বিশেষ কিছু না। জমিজমা সামান্য আছে, তাতেই চলে যায়। এখানে-ওখানে বেড়াই, ছড়া লিখি।"

গৌর বলল, "এত লোক পালাচ্ছে কেন ? হাতে তরোয়াল, রাজপুত বলে মনে হল, তারাও পালাচ্ছে, কেন ?"

লোকটি বলল, "পালাবে না !" বলেই ছড়া কাটল—

"ক্ষেত্রি রাজপুত জত তলয়ারের ধ্বনি।
তলয়ার ফেলাইঞা তারা পলান য়মনি ॥"

লোকটা মুখে-মুখে ছড়া বানায়। গৌর অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটি আবার বলল, "চলুন মশাই, দাঁড়িয়ে থাকবেন না, বর্গিরা এসে পড়বে।"

গৌরপ্রসন্ন বর্গির নাম দু'-একবার শুনেছে, তাদের সম্বন্ধে আর কিছু-জানে না। সে কোনও কথা না বলে গঙ্গারামের সঙ্গ নিল। রাস্তায় যেতে-যেতে দেখল, পিছনে আরও অনেক লোক আসছে। নানা শ্রেণীর লোক। তাদের পেশা কী, কখনও-কখনও বোঝা যাচ্ছে তারা সঙ্গে কী নিয়ে পালাচ্ছে তাই দেখে। গঙ্গারাম পরে একসময় লিখেছিল—

"কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি।
জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ি ॥
সঙ্ক বণিক পলাএ করাত লইয়া যত।
চতুর্দিগে লোক পলাএ কি বলিব কত ॥"

আরও কিছুদূর গিয়ে গৌরপ্রসন্ন শুনল সামনের দিক থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। মনে হল, সেখানে অসংখ্য লোক। একটা তোপধ্বনি হল। গৌর বলল, "ওই বুঝি।"

গঙ্গারাম ঘাড় নাড়ল, তারপর বলল, "ছুটে চলো, ওই ওরা এসে পড়ল বলে।"

গৌরপ্রসন্ন পিছন ফিরে দেখল সূর্যের অস্পষ্ট আলোতে আকাশের এক অংশ কালো হয়ে গিয়েছে।

গঙ্গারাম বলল, "দেখেছ, বর্গিদের ঘোড়ার খুরের ধুলো আকাশকে কীরকম কালো করে দিয়েছে। আর-একটু জোরে ছুটতে পারবে ? ওরা এসে পড়েছে।"

ওরা দু'জনে ছুটে এসে মানকরে নবাবের শিবিরের কাছে এসে পৌঁছল। তখন আরও আলো কমে এসেছে। নবাবের সৈন্যরা তেমন প্রস্তুত ছিল না মনে হল। সৈন্যরা তখন শিবিরের কাছে দুটো বড় তোপ টেনে আনছে। একদল সৈন্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে শিবিরে ঢোকার পথ বন্ধ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে গঙ্গারাম গৌরপ্রসন্নকে নিয়ে ঢুকে গিয়েছে। ঢুকে দেখল, চারদিকে বিশৃঙ্খলা। কামান দুটো ততক্ষণে ঠিক জায়গায় বসানো হয়েছে। বর্গিরা যদি রাত্রে হঠাৎ আক্রমণ করে !

সে-রাত্রি ওইভাবে কাটল। থেকে-থেকে তোপের আওয়াজ কিংবা বন্দুকের শব্দ। এখানে-ওখানে মশালের আলো। গঙ্গারাম ও গৌরপ্রসন্ন যতদূর সম্ভব ভিতরে ঢুকে গিয়ে শুয়ে ছিল, কিন্তু ঘুম হওয়া সম্ভব ছিল না। পরদিন সকাল হল, বর্গিরা আরও কাছে এসে পড়েছে এবং নবাবের শিবির প্রায় ঘেরাও হয়ে গিয়েছে। বর্গিদের হাতে তরোয়াল, কারও-কারও হাতে আবার বর্শা। তারা ঘোড়ায় চড়ে শিবির প্রদক্ষিণ করার চেষ্টা করছিল। গৌরপ্রসন্ন আগে কখনও এ-সব জিনিস দ্যাখেনি। এমন সময় পিছন থেকে কে যেন তার ঘাড় ধরে নিচু করে দিলে। জোরে ঘাড় ধরা ছিল, গৌর বুঝতে পারল না কী হচ্ছে, কিন্তু বাঁ হাতে আততায়ীকে চড় কষিয়ে দিল। চড়টা বেশ জোর হয়েছিল। কয়েকটি লোক হাঁ-হাঁ করে উঠল। যে-লোকটা গৌরপ্রসন্নর ঘাড় ধরেছিল, দেখল, সে একটা সিপাই, মাটিতে পড়ে গিয়েছে। গৌরপ্রসন্ন তাকিয়ে দেখল, তার সামনে সুন্দর লাল পোশাক পরা তার বয়সী একজন ছেলে। দেখতে খারাপ নয়, কিন্তু

মুখের ভাব দেখলে আর ভালবাসতে ইচ্ছে করে না। তার পিছনে কয়েকজন সৈন্য, দেহরক্ষী। সে এসে কর্কশ স্বরে বলল, "কেঁও শোর মাচাতে হো।"

একজন বুঝিয়ে দিল ইনি ছোটে নবাব সিরাজদ্দৌলা।

গঙ্গারাম পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, "সেলাম করে বলুন যে, হুজুর দেখতে পাইনি ; কসুর মাফ করুন।"

গৌরপ্রসন্ন ঝুঁকে পড়ল, বলল, "মাফ কীজিয়ে। নহী পহচান সকা। কসুর মাফ কীজিয়ে।"

একটা কিছু হচ্ছে জেনে সৈন্যরা এগিয়ে এল। গৌরপ্রসন্নকে দেখে অবাক হল। ভাবছে, কী চায় ছেলেটা ছোটে নবাবের কাছে।

ছোটে নবাব জিজ্ঞেস করলেন, "তুম কৌন হো ? ইধার ক্যাসে ঘুসে ?"

উত্তর দিল গঙ্গারাম। সে একটু উর্দু বলতে পারে, বলল, "হুজুর, গুস্তাখী মাফ কীজিয়ে। ইয়ে হামারা দোস্ত হ্যায়, জমিন্দার কা বেটা। বর্গীকে ডরকে মারে হামলোগ ইধার ভাগ আয়ে আউর হুজুরকে পাশ আশ্রয় মিলা।"

ছোটে নবাব একটু ভ্রূ কুঁচকোলেন, বললেন "জমিদারের ছেলে ? কোথাকার জমিদার ?"

গৌরপ্রসন্ন বলল, "তুলসীঘাট। ইঁহা সে সাড়ে চার কোস দূর।"

ছোটে নবাব বললেন, "জমিদারের ছেলে, তবে তো তরোয়াল চালাতে জানে।" এই বলে পাশের দিকে তাকিয়ে একটি লোককে ডাকলেন 'শামসুল' বলে।

একটি বছর-চল্লিশের লোক এসে দাঁড়াল। সে ছোটে নবাবের খুব বিশ্বাসী। ছোটে নবাবের দেহরক্ষী, কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে সৈন্যদলে কেউ ভর্তি হতে চাইলে তাকে পরীক্ষা করা। তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ইসে সমঝ লো।"

শামসুল বলল, "জী।"

তার কথায় তিনটে তরোয়াল হাজির করা হল। গৌরপ্রসন্ন তার থেকে একটা বেছে নিল। শামসুলের কোমরে তো তরোয়াল ছিলই। এর মধ্যে মজা দেখতে আরও অনেক সৈন্য এসে জুটেছে। তারা নবাব ও যোদ্ধাদের মাঝখানে রেখে চারদিক ঘিরে রাখল। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র শামসুল গৌরপ্রসন্নকে তরোয়াল দিয়ে আঘাত করল। সেই আঘাত গৌরপ্রসন্নের তরোয়ালের উপর এসে পড়ল। গৌরপ্রসন্ন বুঝতে পারল আর-একটু জোরে হলে তার হাত থেকে তরোয়াল পড়ে যেত। সে সাবধান হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। খুব জোরে শামসুলকে আঘাত করতে চেষ্টা করল। শামসুলের হাত থেকে তরোয়াল পড়ে গেল। গৌরপ্রসন্ন একটু অবাক হল ; ভাবল, শামসুল তো কাঁচা নয়। তার হাত থেকে তরোয়াল মাটিতে পড়ে যেতেই গৌর এক পা এগিয়ে তরোয়ালটিকে জুতো দিয়ে চেপে ধরল।

শামসুল বলল, "ব্যস।"

সিরাজদ্দৌলার মেজাজ আরও খারাপ হল। শামসুলের হাত থেকে তরোয়াল পড়ে যাবে একথা তিনি ভাবেননি।

শামসুল আবার বলল, "ব্যস।" মানে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।

ছোটে নবাব বিরক্ত হলেন। শামসুলের পরাজয় তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না, বললেন, "খতম নহীঁ হুয়া। ফির শুরু করো, অভী তো

১৯১৭ : জার্মানির আরও যুদ্ধবিমান

অ্যালবাট্রস স্কাউট

১৯১৭ সালে জার্মানি নিয়ে এল উন্নত অ্যালবাট্রস ফাইটার বিমান, যা ব্রিটিশ ও ফরাসি বৈমানিকদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে। বিশেষ করে এর আধুনিক ডিজাইন ও গতিবেগ বিমানটিকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে।

বিমানের বিশদ বিবরণ :
নির্মাতা : অ্যালবাট্রস ওয়ের্ক, বার্লিন।
লম্বায় : ২৪ ফিট বা ৭·৩২ মিঃ।
ডানার আয়তন : ২৯·৭ ফিট বা ৯·০৪ মিঃ।
বৈমানিক : একজন বৈমানিক।
অস্ত্রসম্ভার : দুটি মেশিনগান, দুটিই সামনের দিকে।
গতিবেগ : ঘণ্টায় ১০৩ মাইল বা ১৬৫ কি· মি·।
একটানা ওড়ার ক্ষমতা : ২ ঘন্টা।
এঞ্জিন : একটি ১৭০ অশ্বশক্তির মার্সিডিজ ডি-৩এ।

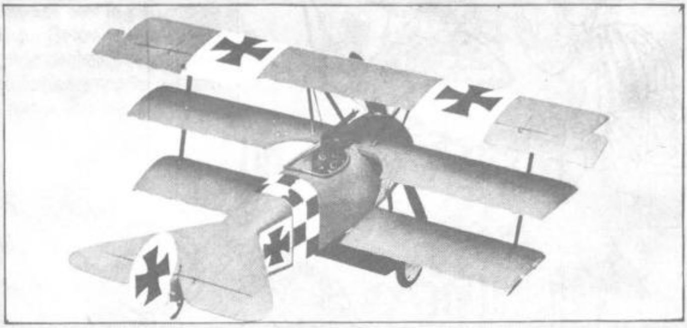

ফকার ট্রাইপ্লেন

ফকার ট্রাইপ্লেন

রাইনহোল্ড প্ল্যাটের নকশায় নির্মিত এই ফকার ডি আর-১ বিমানটি ছিল জার্মানির একমাত্র তিন ডানার ফাইটার বিমান। যুদ্ধে এর অবদান ছিল অনেক। বিখ্যাত জার্মানি আকাশবীর 'রেড ব্যারন' ফন রিক্টোফেনের স্কোয়াড্রনে এই বিমান ব্যবহৃত হয়। প্রায় ৩০০-র কিছু বেশি ট্রাইপ্লেন যুদ্ধে যোগ দেয়, কিন্তু এর কাঠামোতে একটি গলদ থাকায় কয়েকটি বিমান আকাশে ওড়ার সময়ে ভেঙে পড়ে। এর পরে বিমানটির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

বিমানের বিশদ বিবরণ :
নির্মাতা : ফকার ফু গৎসিউগ ওয়ের্ক—শোয়েরিন, জার্মানি।
লম্বায় : ১৯ ফিট বা ৫·৭৯ মিঃ।
ডানার আয়তন : ২৩·৬ ফিট বা ৭·১৯ মিঃ।
বৈমানিক : একজন বৈমানিক।
অস্ত্রসম্ভার : দুটি মেশিনগান।
গতিবেগ : ঘণ্টায় ১১৫ মাইল বা ১৮৫ কি· মি·।
একটানা ওড়ার ক্ষমতা : দেড় ঘণ্টা।
এঞ্জিন : একটি ১১০ অশ্বশক্তির ওবেরুসেল।

খুন হী নহী নিকলা।"

হুকুম পেয়ে শামসুল তরোয়াল আবার তুলে নিল। সৈন্যের সংখ্যা আরও বেড়েছে, একটু ঠেলাঠেলি পড়ল। শামসুল এবারও তরোয়াল দিয়ে আঘাত করল। গৌর শক্ত হাতে তরোয়াল ধরে ছিল। পরক্ষণে আবার দু'জনের খেলা চলল। কিছুক্ষণ খেলা চলবার পর গৌর সেই তরোয়াল সামনে চালিয়েছে, এমন সময় শামসুল কীরকম শব্দ করে হাতের তরোয়াল ফেলে দিল। গৌর তাকিয়ে দেখল, শামসুলের মণিবন্ধ রক্তে ভেসে যাচ্ছে; তবু শামসুলের চোখে কেন হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

ছোটে নবাব বললেন, "ব্যস,করো।" এই বলে একটা বিরক্তিসূচক আওয়াজ করে চলে গেলেন।

সৈন্য যারা জমা হচ্ছিল তারাও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এর মধ্যে একজন লোক ওষুধপত্র নিয়ে এসেছিল ক্ষতস্থান বেঁধে দেবে বলে। গৌরপ্রসন্ন তাকিয়ে দেখল, তার হাতে কিছু গাঁদার পাতা রয়েছে। সেটা বেটে লাগিয়ে দেওয়া হল, তারপর অন্য ওষুধ।

গৌরপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করল, "ওস্তাদ, তোমার লাগল কী করে? আমি বুঝতেই পারিনি আমার হাতে তোমার কোনও বিপদ হতে পারে।"

শামসুলের চোখে আবার একটু হাসির ঝিলিক খেলে গেল। গলা নামিয়ে বলল, "পরে সব বলব, অনেক লোক রয়েছে। তবে শোনো, তুমি কিন্তু তরোয়াল খেলা বিশেষ কিছু জানো না। এখানে যদি থাকো আমি তোমাকে দু' দিনে শিখিয়ে দেব, পাকা করে তুলব। দেখা যাক, ছোটে নবাবসাহেবের কী মর্জি।" এই বলে হেসে অন্যদিকে চলে গেল।

গঙ্গারাম বলল, "অনেক হয়েছে।"

সেদিন এইরকমই গেল। শামসুলের হাত থেকে যে তরোয়াল পড়ে গেছে, এই কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে বেশি দেরি হল না। গৌর শামসুলের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দেখা হল না। শামসুল কোথায় গেছে কে জানে। তখনও শিবিরে রসদের অভাব হয়নি। সাধারণত শিবিরের সঙ্গে-সঙ্গে মুদির দোকান, সবজির দোকান চলে। কিন্তু বর্গিরা কাউকে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। তবে সে-রাত্রে শিবিরে খাবার ছিল। চাল, ডাল, তেল, ঘি, অল্প আনাজ। গৌর খিচুড়ি বানাল। তাই খাওয়া হল। গৌর নিজে রাঁধল, কারণ গঙ্গারামের ছোঁয়া তো সে খাবে না। খেতে-খেতে গৌরপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করল, "বর্গির আক্রমণে তো আমরা তটস্থ হয়ে আছি। এরা কারা? কোথা থেকে এল?"

গঙ্গারাম বলল, "আমি কী সব জানি যে, তোমাকে বলব। তবে যতটুকু শুনেছি তোমাকে বলছি। কথাটা তো বর্গি নয়, মারাঠি শব্দ 'বারগির' থেকে এসেছে।"

গৌরপ্রসন্ন বলল, "তা তো না হয় বুঝলাম। বর্গিই বলো বা বারগিরই বলো, এরা এখানে এল কী করতে?"

গঙ্গারাম বলল, "শোনো, তুমি কি সেই কথা জানো না? পৃথিবীতে এত পাপ হচ্ছে দেখে স্বর্গের দেবতারা খুব বিচলিত হয়েছিলেন। পার্বতী আর মহাদেব বললেন, দূত পাঠিয়ে এই পাপীদের সংহার করতে হবে। শিবাজির পৌত্র সাহু তখন সাতারায় রাজত্ব করছিলেন। ইনি নাগপুরে রঘুজি ভোঁসলাকে খবর পাঠালেন। রঘুজি ভোঁসলা বললেন, বাংলার নবাবের অপরাধের সীমা নেই। সে কর দেওয়া বন্ধ করেছে। হুকুম পেলেই আমি তাকে আক্রমণ করব এবং সাহু রাজার যা প্রাপ্য নিয়ে আসব।

"ওখানে রঘুজি ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত উপস্থিত

ছিলেন। রঘুজি সেনাপতি ভাস্করকে সেইরকম আদেশ করলেন।"এই বলেই গুনগুন করে আবার সুর ভাঁজলেন—

"রঘু তবে আজ্ঞা দিলা ভাস্করে।
তৎকান করিয়া চৌথাই আনি দিবা মোরে॥

"দেখতে পাচ্ছ না বর্গিদের কীরকম বল। নবাব এত করেও তাদের তাড়াতে পারছেন না। সবই হর-পার্বতীর দয়া।

"যত দিন যেতে লাগল তত শিবিরের মধ্যে খাবার জোগাড় করার কষ্ট বাড়তে লাগল। বর্গিরা শিবিরে ঢুকতে পারল না ঠিক, কিন্তু নবাবকে যতরকম অসুবিধেয় ফেলা যেতে পারে. বর্গিরা তার চেষ্টা করছিল, সফলও হয়েছিল। কিছুদিন থেকে দু'বেলা খাওয়া তো শিবিরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গঙ্গারাম পরে লিখেছিল শিবিরের অবস্থা এইরকম—

"চাউল কলাই মটর মুষরি খেসারি।
তেল ঘি আটা চিনি লবণ একসের করি॥
টাকা সের হৈল আনাজ কিন্তে নাই পাত্র।
খুদ্র কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাত্র॥

"এইরকম যখন অসহনীয় অবস্থা, তখন গঙ্গারাম একদিন রাত্রে গৌরপ্রসন্নকে বলল, 'একবার বাইরে যাব ভাবছি, দেখে আসি অবস্থাটা কী রকম।'"

গৌর বলল, "বাইরে যাবে কী করে?"

গঙ্গারাম বলল, "সে তুমি ভেবো না। শেষরাতে বেরিয়ে পড়ব। পাহারাদারদের বলা থাকবে। ব্যবস্থা আমি করেছি।"

গৌর বলল, "বেরোতে না হয় পারবে, কিন্তু ফিরবে কীভাবে? হয়তো আর ফিরতে পারবে না।"

গঙ্গারাম বলল, "ফিরব ঠিকই। সে-ব্যবস্থাও আছে, তবে তুমি সাবধানে থেকো। কারও সঙ্গে আবার ঝগড়া করে বোসো না।"

গঙ্গারাম পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। বাইরে সেরকম তোপধ্বনি, শেয়াল-কুকুরের ডাক শোনা যেতে লাগল। থেকে- থেকে বর্গীদের বিকট চিৎকার। খুব ভোরে দেখল, তার পাশের জায়গা খালি।

গঙ্গারাম পরদিন ফিরতে পারেনি। দু'দিন পরে গৌরপ্রসন্ন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে দ্যাখে তার পাশে গঙ্গারাম বসে আছে, মুখে অল্প-অল্প হাসি। বেরোবার আগে মুখের চেহারা বদলে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, এখনও তার চিহ্ন রয়েছে।

গৌরপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি উঠে তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "কী দেখলে ?"

গঙ্গারাম বলল, "শুনবে ? শোনো তা হলে। শেষরাত্রের দিকে দেখলাম, বর্গিদের গোলার আগুনে গ্রাম পুড়ে যাচ্ছে। লোক পালিয়ে যাচ্ছে। আমি তাদের সঙ্গে জুটে গেলাম। ভাবলাম, বর্গিরা আমাদের দেখতে পায়নি। তারপর যা হল তা তুমি ভাবতে পারবে না।"

গৌরপ্রসন্ন চোখ বড়-বড় করে গঙ্গারামের কথা শুনছিল, বলল, "তারপর ?"

নাইন স্টার গেম

এই মজার নাইন স্টার খেলায় প্রত্যেক প্রতিযোগীকে তার পছন্দমতো তিনটে রং একটা সারিতে সাজাতে হবে— খাড়া, অনুভূমিক অথবা কোনাকুনিভাবে। খুব দ্রুত এই খেলা চালু করা যায় এবং এটা বেশ আকর্ষকও বটে। সার্কিটটা এমনভাবে সাজানো যে, তার মধ্যে 'মাস্টার' এবং 'চ্যালেঞ্জার', এই দুটো প্লেয়ারের দল থাকে। মাস্টার প্লেয়ারের একটা সুইচ আছে যেটা খেলা শুরু করার ইঙ্গিত দেয়, চ্যালেঞ্জার সাইডে। এবং কী আশ্চর্য, মাস্টার সুইচ অপারেট করে যে-সমস্ত রং নির্বাচন করা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করে চ্যালেঞ্জারের পক্ষে আলো জ্বালানো আর কখনওই সম্ভবপর নয়। এ এক দারুণ মজার খেলা।

খেলার সার্কিট

একমাত্র 'প্লে' ইনডিকেটর ছাড়া— একই সুইচিং সার্কিট ন'বার ডুপ্লিকেট করা হয়েছে, ন' জোড়া বাল্বের জন্য। চিত্র 4.1-এ একজোড়া বাল্ব ও সুইচ, এ ছাড়া প্লে সার্কিটও দেখা যাচ্ছে।
প্লে সুইচ চালু হলে প্লে বাল্ব জ্বলে উঠবে। এর ফলে বোঝা যাবে গেম বাল্বের জন্য কারেন্ট আসছে। এই সুইচ আরও বোঝাচ্ছে যে, বাল্বগুলো খেলা শেষ হয়ে গেলে মাত্র একটা অপারেশনেই অফ করে দেওয়া যাবে। অযথা ব্যাটারি নষ্ট হবে না। যদিও এই খেলা সহজেই একটা ট্রান্সফরমার থেকেও চালু করা সম্ভব।
চিত্র 4.1-এর S1 হচ্ছে ন'টা সুইচের অন্যতম একটা সুইচ। ধরা যাক S1 সুইচই প্রথম নির্বাচন করা হল, সার্কিট হচ্ছে ব্যাটারি পজিটিভ থেকে, ভায়া S1 ইনডিকেটর L1 পর্যন্ত, আবার ব্যাটারিতেই ফিরে এসেছে। আর সেইজন্যই L1 জ্বলবে। যদি চ্যালেঞ্জার ওই একই স্কোয়ার নির্বাচন করতে চায় S2 অন করে— তা হলে L2 জ্বলবে না। তার কারণ এর আগে S1 অপারেট করে সার্কিট ব্রেক করে দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে যদি S1 অপারেট করা না হয় এবং চ্যালেঞ্জার S2 নির্বাচন করে, তবে তার ল্যাম্প L2 জ্বলে উঠবে। ইনটারলকিং অথবা সার্কিট ক্যাপচারিং এই অবস্থায় ঘটার সম্ভাবনা নেই, কেননা এটা স্পষ্ট যে, মাস্টার কোনও বেআইনি চাল চালবে না।
ওয়্যারিং-এর ব্যাপারটিও খুব সরলীকরণ করা হয়েছে, সাদা রং ব্যাটারি পজিটিভ থেকে সুইচে নিয়ে। এ ছাড়া নীল রং মাস্টার ইনডিকেটর, হলুদ রং চ্যালেঞ্জার ইনডিকেটর এবং ধূসর রং ইনটারসুইচ সার্কিটে গিয়েছে। এ ছাড়া অন্য রংও অবশ্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

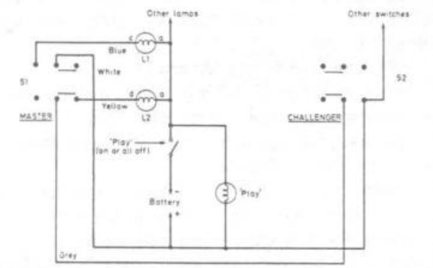

চিত্র 4.1— একজোড়া ল্যাম্প L1 এবং L2-র সাহায্যে দেখানো হয়েছে

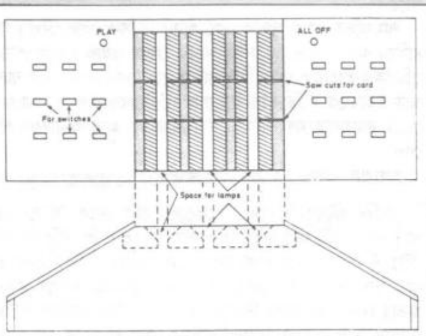

চিত্র 4.2—কাঠের অংশগুলো যেভাবে জোড়া হয়েছে

যেসব উপকরণ লাগবে

আঠারোটা সুইচ চাই দুটো প্লেয়িং বোর্ডের জন্য। যারা চ্যালেঞ্জার সাইডে খেলবে, তাদের Single Pole দরকার আর যারা মাস্টার সাইডে খেলবে তাদের থাকবে Two Pole এবং অলটারনেটিভ মেক পজিশন। সবচেয়ে ভাল হবে সমস্ত সুইচই যদি একরকম হয় ; অর্থাৎ 2-Pole—2-Way টাইপ। বাল্ব লাগবে 6.3V 0.15A— এগুলো 6V ব্যাটারির সাহায্যে চলবে। অন্য ধরনের বাল্ব— যা উপযুক্ত ব্যাটারির সঙ্গে লাগানো যায়, তাও ব্যবহার করতে পারো। বাল্ব হোল্ডারও সেইরকম চাই।

কাঠের অংশ

চিত্র 4.2-এ কাঠের বাক্স এবং তার ঢালু অংশের চেহারা দেখানো হয়েছে। এর Sideগুলো হচ্ছে 10 মিমি অথবা ওইরকম কাঠের, সুইচের প্যানেল প্রত্যেকটি 178×165 মিমি, হার্ডবোর্ড অথবা পাতলা প্লাইউড হবে 4 মিমি। সুইচের জন্য উপযুক্ত গর্ত করে কেস সাইডে আঠা লাগিয়ে দাও এবং স্ক্রু অথবা প্যানেল পিন দিয়ে বোর্ড ফিট করো। প্রান্তদেশগুলি 178×38×6 মিমি Stripes দিয়ে ভর্তি করে দাও। Four Shaped মেম্বার সাইডের মাঝে চিত্র 4.2-এ যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ফিট করা দরকার। এগুলো অবশ্য 158 মিমি লম্বা হবে যখন Sideগুলি হবে 10 মিমি।

ল্যাম্প

চিত্র 4.3-এর মতো

"তারপর—

"এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে ।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিল আইসা তাথে ॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান ।
একি চোটে কারু বধএ পরান ॥

"এখানেই শেষ নয় । যারা অনেক টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল তাদেরও অবস্থা কিছু ভাল হল না । বর্গিরা তাদের সর্বস্ব লুঠ করে নেয় ।

"রূপি দেহ রূপি দেহ বোলে বারে বারে ।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে ॥

"সহজে কি লোকে টাকা দিতে চায় ! শেষ সম্বল । যারা টাকা দিতে চাইল না, বর্গীরা তাদের পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখল । জলের

পার্থসারথি চক্রবর্তী

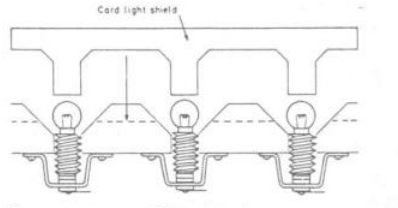

চিত্র 4.3—ল্যাম্প হোল্ডার ফিটিং

ল্যাম্প হোল্ডারদের ঠিক জায়গায় বসিয়ে স্ক্রু লাগাতে হবে । দুটো ল্যাম্পহোল্ডার প্রত্যেকটি ন'টা স্টার-এর খুব কাছাকাছি থাকবে; এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে বিভিন্ন বাল্ব থেকে ধারেকাছে আলো ছড়িয়ে না পড়ে । একটা সেটের ন'টা বাল্ব হবে সাদা । অন্য সেট হবে রঙিন । সাদা বাল্ব অবশ্য তুমি নিজেও রঙিন করে নিতে পারো । পরিষ্কার সাদা বাল্বে গোলাপি নেল-পালিশ করে নিলেই চলবে ।

ডিসপ্লে

চিত্র 4.4-এ যেমন দেখানো হয়েছে সেইরকম আঁকো একটা পাতলা কার্ডে । তারপর একটা ধারালো কাঁচি অথবা ছুরি দিয়ে Star Shape-এর মতো করে কেটে নিতে হবে । এই কার্ড রাখবে কেস-এর সবচেয়ে ওপরে । তারপর ওটাকে কাচ অথবা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের সাহায্যে ঢেকে দেওয়া প্রয়োজন । ছোট স্ক্রু দিয়ে আটকে দাও ওটাকে । চিত্র 4.4-এর মতো পাতলা সাদা কাগজ, ন'টা স্কোয়ার টেনে নিতে হবে— যেটা যাবে কার্ড এবং গ্লাসের মধ্যে । এখন স্টারগুলো জ্বলতে থাকলে তবেই দেখা যাবে— সাদা অথবা গোলাপি রঙে । এর থেকে বোঝা যাবে কোন খেলোয়াড় সেই স্কোয়ার নির্বাচন করেছে ।

ওয়্যারিং

চিত্র 4.6-এ বিস্তারিতভাবে খেলার অভ্যন্তরের যাবতীয় ব্যাপারটা বোঝানো হয়েছে । সমস্ত ল্যাম্পহোল্ডার পরস্পরের সঙ্গে A-তে যুক্ত, যেটা আবার ব্যাটারির নেগেটিভে গিয়েছে All Off সুইচের মাধ্যমে ।

সমস্ত সুইচই B-তে জয়েন করা হয়েছে যেটা অন্য ব্যাটারি টার্মিনালের সার্কিট । ওয়্যার E-E সমস্ত সুইচের মধ্যেই ঢোকানো যাবে । C ওয়্যার করতে হবে লাল ল্যাম্পহোল্ডারে এবং D সাদা ল্যাম্পহোল্ডারে ।

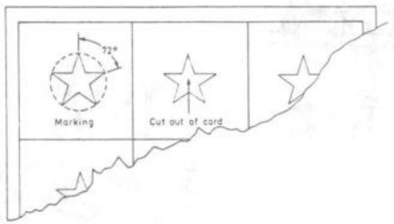

চিত্র 4.4—স্টার আকারের মতো করে কেটে নেওয়া হচ্ছে

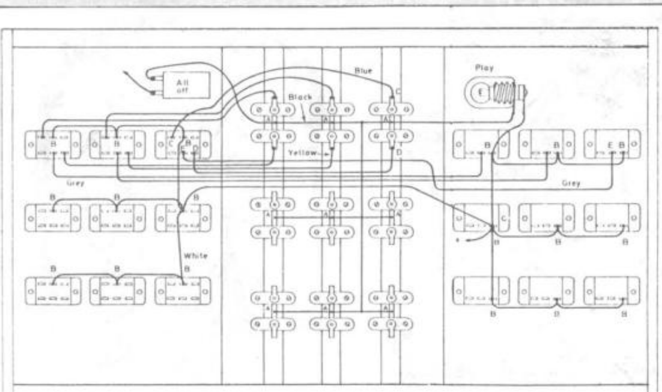

চিত্র 4.6—তিন সেট ল্যাম্প ও সুইচের ভেতরের ওয়্যারিং

চিত্র 4.6-এ সমস্ত ওয়্যারিং দেখানো হয়েছে এক সারি ল্যাম্পের জন্য, বোর্ডের দু' দিকেই । এই কানেকশন ডুপ্লিকেট করতে হবে মাঝখানের এবং নীচের সারির ল্যাম্পে । প্রয়োজন মনে করলে Nine স্কোয়ারের প্রত্যেকটা টেস্ট করে দেখতে পারো, যখন দুটো সুইচ যেটা একজোড়া বাল্ব কন্ট্রোল করছে সেগুলো ওয়্যারিং হবে । এখানে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয় । কেবল একটা কথা মনে রাখবে, ন'টা সেটের সুইচ ও ল্যাম্পের প্রত্যেকটিতে একরকমভাবেই ওয়্যারিং করা দরকার, শুধুমাত্র ডুপ্লিকেট কানেকশন S1, S2, L1 এবং L2 পর্যন্ত, চিত্র 4.1-এর মতো ।

তলায় তাদের দমবন্ধ হয়ে যেতে লাগল।"

বর্গিরা কতদূর গিয়েছে? সে-কথাও গঙ্গারাম বলেছিল গৌরপ্রসন্নকে। "সে-সব বিখ্যাত জায়গা। বেশির ভাগ জায়গায় ফলাও কারবার ছিল। গ্রামের লোক ধনী। সে-সব জায়গার নাম কত বলব। যেমন—চন্দ্রকোনা, মেদিনীপুর, দিগনপুর, ক্ষীরপাই, সেড়পা, চণ্ডীপুর, পলাশি, মাহাতাপুর, পাটলি, আতাইহাট, পাতাইহাট। কাগা-মোগায় ওলন্দাজদের কুঠি তারা পুড়িয়ে দিল কিন্তু হুগলির কোনও ক্ষতি করতে পারল না। সেখানে পির খাঁ ফৌজদার সৈন্যসামন্ত নিয়ে তৈরি ছিল। যাই বলো, কামানকে সবাই ভয় পায়। বিশেষত ইংরেজের কামানকে, ফরাসিদের কামানকেও। আমাদের নবাবেরও অনেক কামান কিন্তু তেমন ভাল গোলন্দাজ নেই। থাকলে জিনিসটা অন্যরকম হতে পারত।"

গৌরপ্রসন্ন কিছু বলল না, চুপ করে থাকল। একথা সে ভেবে দ্যাখেনি।

গঙ্গারাম আবার বলল, "রাত্রি শেষ হতে আর দেরি নেই, এইবার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।" এই বলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

ভোর হল। গৌরপ্রসন্ন দেখল, গঙ্গারাম কখন বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়েছে। সে বাইরে গিয়ে দেখল, একটু দূরে গঙ্গারাম চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। গৌরকে আসতে দেখে নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করে বলল, সে যেন চুপ করে থাকে, কথা না বলে। সে আঙুল দিয়ে একটা দিক দেখাল। গৌরপ্রসন্ন সেদিকে তাকিয়ে দেখল, একটা লোক মই দিয়ে উঠে বড় নবাব সাহেবের তাঁবুর ছাদে কী যেন করছে। ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে পারল, একটা লোক দুটো বাতাসা, একটা তামাক খাবার টিকে নিয়ে কী যেন করছে। গঙ্গারাম তাকে আবার কী যেন ইশারা করল। গৌরপ্রসন্ন এবার বুঝতে পারল, একটু ভেতরে গিয়ে ঘুরে এল, তার হাতে একটি বন্দুক। শামসুল তাকে বলেছিল তার কাছে তরোয়াল খেলা শেখার জন্য, তার শেখা হয়নি। শামসুলেরও সময় ছিল না, কিন্তু বন্দুকে তাক করবার অনেক সুযোগ পেয়েছিল। সে আগেও দু-চারবার বন্দুক চালিয়েছে নিজের গ্রামে। পাখিই মেরেছে, শূকর তাড়িয়েছে কিন্তু কালেভদ্রে বন্দুক

চালালে হাতের টিপ ভাল হয় না। এই ক'দিন শিবিরে থেকে ক্রমাগত বন্দুক ছুঁড়ে তার টিপ অনেক ভাল হয়েছে। আর-একবার গঙ্গারাম তাকে ইশারা করল। সে বন্দুক তুলে উপরে লোকটার দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ল। মুখে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করে লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। গঙ্গারাম তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এ পিরু মিঞা না, ওখানে কী করছিল?"

শিবিরের ভিতরে বন্দুকের শব্দ শুনে সৈন্যরা চারদিক থেকে ছুটে এল। লোকটা পিরুমিঞাই বটে, কিন্তু আসল পিরুমিঞাই নয়। পরে জানা গেল সে পিরু মিঞার নাম নিয়েছিল। আসলে সে বর্গীদের গুপ্তচর। কী করছিল ওখানে? গঙ্গারাম বুঝিয়ে দিল পূর্ববঙ্গে এরকম জিনিস হয়। একটা বাতাসার সঙ্গে টিকে বেঁধে ঘরের চালের দিকে ছুঁড়ে দিতে হয়। দুটো-তিনটে জায়গায় এরকম করতে পারলে ভাল হয়। কাক বাতাসা ও টিকে নিয়ে উঁচু জায়গায় বসবে। খড়ের চালে এক নিমেষে আগুন লেগে যায়। লোকটা আজ কোনও ক্ষতি করবার আগেই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে, ক্ষতি করতে পারেনি। লোকে বলতে লাগল, 'আর কোনও তাম্বু নয়, নবাবের তাম্বুর উপরেই হামলা!' লোকটার কী মতলব ছিল এর থেকেই বোঝা যায়।

গোলমাল বেড়েই চলেছে। নবাব আলিবর্দি কারণ জানতে চাইলেন, তারপর গৌরপ্রসন্ন ও গঙ্গারামকে ডেকে পাঠালেন। তারা নবাবের খাস তাঁবুতে ঢুকে দেখল, একটা খাটিয়ার উপর লাল রঙের তোশক তার উপরে একটা দামি চাদর পাতা আর পাশে একটা খাটিয়ায় ছোটে নবাব বসে আছেন। আরও কয়েকজন লোক, সবাই তাদের চেনে না, কিন্তু মনে হচ্ছে খুব উঁচু ধরনের লোক। সেনাপতি-টতি হতে পারে। সবাই খুব আস্তে-আস্তে কথা বলছিল, কিন্তু বোঝা গেল খুব উত্তেজিত। গঙ্গারাম ও গৌরপ্রসন্ন ঘরে ঢুকে নবাবকে ঝুঁকে সেলাম করল, ছোটে নবাবকেও করল। নবাবকে গৌরপ্রসন্ন বা গঙ্গারাম কাছ থেকে কখনও দ্যাখেনি। এইবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল, তাদের সামনে একজন বুড়ো মানুষ বসে আছেন। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, বুকে জামার পাশে একটা ছোরা, পিছনে একটা তরোয়াল রাখা আছে, পরনে সাদা পোশাক, মাথায় চুলের উপরে একটা রঙিন কাপড় বাঁধা।

নবাব সব কথা শুনে বললেন, "তোমরা কি আমার সৈন্যদলে কাজ করো?"

তারা ঘাড় নাড়ল।

নবাব জিজ্ঞেস করলেন, "তবে এখানে এলে কী করে?"

তারা আগেও একথা অনেককে বলেছে, নবাবকেও তাই বলল।

নবাব জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কত করে তন্‌খা পাও?"

তারা জানাল, "কিছুই না।"

নবাব বললেন, "বড় আফসোস। আচ্ছা আমি হুকুম দিয়ে দিচ্ছি।"

একজন সৈন্য এসে তাদের নবাবের তাঁবুর বাইরে নিয়ে গেল। ঘন্টা দুয়েক পরে নবাবের হুকুম বেরোল। গৌরপ্রসন্ন জমিদারের ছেলে, বন্দুক চালাতে শিখেছে, তাই তাকে রক্ষী-দলে কাজ দেওয়া হল। তার তন্‌খা পরে ঠিক করে দেওয়া হবে।

গঙ্গারামও কাজ পেল। কিন্তু সে-কাজ খুব সম্মানের নয়। সে তো অস্ত্রশস্ত্র ভাল করে চালাতে শেখেনি। নবাব ডাকলে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে গল্প শোনাবে, আর মাঝে-মাঝে সৈন্যদেরও গান শোনাবে সন্ধেবেলা। তার মাইনেও পরে ঠিক হবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

শব্দসন্ধান — রঞ্জন

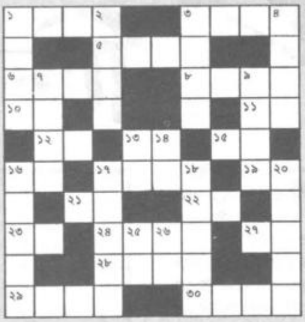

সংকেত : পাশাপাশি : (১) পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম। (৩) '— দিলে গরু কেন করে ছটফট।' (৫) নোবেলজয়ী গীতিকাব্য। (৬) মহাকাশচারী। (৮) ছোট ভাইয়ের উপর বড় ভাই যা ফলায়। (১০) ডাকবিভাগের সঙ্গে এটাও যুক্ত। (১১) টকে যাওয়া। (১২) লাতিন আমেরিকার একটি ছোট দেশ। (১৩) আঠাযুক্ত ফল যার কষ নৌকোয় লাগানো হয়। (১৫) খুব সাধুভাষায় একে বলব ইন্দ্রলুপ্ত। (১৬) পাটজাত। (১৭) মাছ যেমন প্রাণী। (১৯) কাগজের পাইকারি হিসেব। (২১) '— জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা...'। (২২) ক্ষত্রিয়-সম্বন্ধীয়। (২৩) বাঘ, সিংহ। (২৪) এর থেকে সাবধান। (২৭) 'সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায় মেলিল বিপুল —'। (২৮) শেষ দিকে একটু উলটে-পালটে পায়রা। (২৯) 'কাবুলিওয়ালা'র নাম কী? (৩০) রবীন্দ্রনাথের একখানি উপন্যাস।

উপর-নীচ : (১) পরাধীনতা। (২) যাঁর দৌলতে গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ। (৩) প্রাচীন ভারতের মহাকবি। (৪) ফটকিরি। (৭) এমন খাওয়া খেয়েও যার আশ মেটে না সে রামপেটুক। (৯) গানে একাধিক সুরের দ্রুত উচ্চারণ। (১৩) —ফোলা গোবিন্দর মায়ের চালতাতলায় যাওয়া বারণ। (১৪) ঝাল কন্দবিশেষ। (১৬) বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি উপন্যাস। (১৭) নায়েগ্রা কী? (১৮) বিপদ এড়ানোর জন্য অনেকে অঙ্গে ধারণ করে। (২০) মাছরাঙা। (২৫) 'আকাশভরা সূর্য—'। (২৬) ব্যাপৃত, নিযুক্ত।

গত সংখ্যার সমাধান

আ	না	গো	না		ন	ব	নী		অ
না		পা	র	ত্রি	ক		রা	কে	শ
জ	ডু	ল		কো	ল	রি	জ		ন
		ভাঁ		ণ			ন	কি	ব
নি	গ	ড়		মি	সৌ	রি			স
বা			তি	তি	র		য	ত	ন
ত	ড়া	গ			জ		ন্ত্র		
ক		দি	ঙ	না	গ		গ	র	জ
ব	টু	য়া		ম	ৎ	কু	ণ		ন
চ		ন	স্র	তা		ল	ক	ল	ক

কেরিয়ার গাইড

ফিনানশিয়াল অ্যানালিস্ট

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর্থিক বাজারের কাজকর্মও বেড়ে চলেছে। গত কয়েক বছরে দেশে স্টক এক্সচেঞ্জের সংখ্যাও বেড়েছে বেশ কয়েকটি। নানা ধরনের আর্থিক কাজকর্মের জন্য গড়ে উঠেছে আই·ডি·বি·আই·, আই·এফ·সি·আই·, এল·আই·সি·, ইউ·টি·আই·, জি·আই·সি·, আই·আর·বি·আই·-এর মতো সংস্থা। রাজ্যে রাজ্যে রয়েছে স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন এবং স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন। এ ছাড়া দেশ জুড়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখাও আছে প্রচুর। ফলে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ক্রমশ জটিল আকার নিচ্ছে এবং এই কাজে দক্ষ ও কুশলী কর্মীর দরকার। আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সঠিক নীতি নির্ধারণ ও আনুষঙ্গিক কাজকর্মে বেশ বুদ্ধিমত্তার দরকার। আর এই কাজের জন্যই দরকার আর্থিক বিশ্লেষক, অর্থাৎ ফিনানশিয়াল অ্যানালিস্ট।

সব দেশেই আর্থিক কাজকর্ম দারুণভাবে বেড়েছে। এই কাজে দক্ষ কর্মী তৈরি করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় ১৯৫৯ সালে ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড ফিনানশিয়াল অ্যানালিস্টস প্রতিষ্ঠিত হয়। সারা বিশ্বে এটাই অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। তাদের সহযোগিতায় হায়দরাবাদ শহরে ১৯৮৪ সালে ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড ফিনানশিয়াল অ্যানালিস্টস অব ইন্ডিয়া স্থাপিত হয়।

কাদের জন্য এই পাঠক্রম

এই ইনস্টিটিউটের পাঠক্রমকে সংক্ষেপে সি-এফ-এ প্রোগ্রাম বলা হয়। বিভিন্ন সংস্থায় যাঁরা এক্সিকিউটিভ পদে আছেন তাঁরাও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য এই পাঠক্রমে অংশ নিতে পারেন। এ ছাড়া যে-কোনও শাখার স্নাতকও ভর্তি হতে পারেন এই পাঠক্রমে। যাঁরা এখনও স্নাতক হননি, ফাইনাল বছরের ছাত্র তাঁরাও আবেদন করতে পারেন। সবাইকেই ভর্তি-পরীক্ষায় বসতে হয়। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভর্তি-পরীক্ষায় না বসেই সরাসরি সি·এফ·এ· পাঠক্রমে ভর্তি হওয়া যায়। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট, যে-কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এম·বি·এ; চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট, কস্ট অ্যাকাউনট্যান্ট, কম্পানি সেক্রেটারি, সি·এ·আই·আই·বি; ব্যাঙ্কের প্রবেশনারি অফিসার, প্রথম শ্রেণীর গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরাও ভর্তির সুযোগ পেতে পারেন। প্রতি বছর এপ্রিল এবং জুলাই মাসে ভর্তির পরীক্ষা নেওয়া হয়।

নথিভুক্তির নিয়ম

ভর্তির পরীক্ষায় সফল হলে নাম নথিভুক্ত করা যায়। ভর্তির পরীক্ষা যাঁদের দিতে হয় না তাঁরা কোটা অনুসারে সরাসরি নাম নথিভুক্ত করাতে পারেন। নাম নথিভুক্ত হওয়ার তিন বছরের মধ্যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। পুরো পাঠক্রম শেষ করতে হবে সাত বছরের মধ্যে।

সি·এফ·এ· পাঠক্রম

এই পাঠক্রম এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ঋণ, বিনিয়োগ, পরিষেবা—আর্থিক সংগঠনের সমস্ত ক্ষেত্রেই কাজের পরিধিকে বাড়ানো সম্ভব হয়। জ্ঞানের আলোকে এবং অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিতে এইসব কাজকে শিল্পমণ্ডিত করে তোলা এই

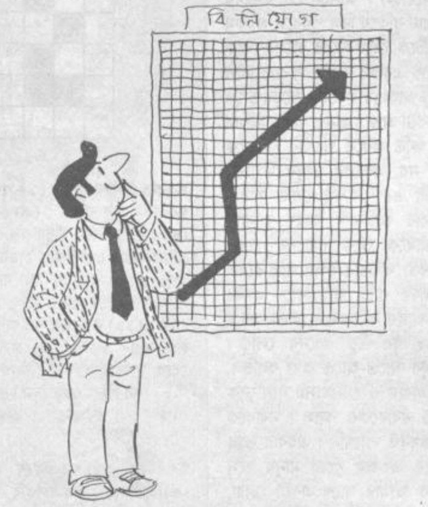

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থকরী সংস্থায় জীবিকার খোঁজ করতে হলে সি-এফ-এ প্রোগ্রাম পড়ে নেওয়া খুবই জরুরি। পেশাদারি এই কোর্সটির প্রবর্তন করেছেন হায়দরাবাদের ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড ফিনানশিয়াল অ্যানালিস্টস অব ইন্ডিয়া। প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন ১৯৮৪ সালে। সি-এফ-এ পাঠক্রমের মূল কয়েকটি আকর্ষণ : (১) ঋণ প্রদান, বিনিয়োগ ও আর্থিক পরিষেবার বিষয়গুলি এখানে ভালভাবে শেখানো হয়। (২) বছরে দু'বার এই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে। করেসপন্ডেন্স কোর্সের মাধ্যমে প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব। (৩) কোচিং ক্লাসের সুযোগের সঙ্গে-সঙ্গে স্টাডি মেটেরিয়ালের সাহায্যও পাওয়া যায়। (৪) ইন্টার এবং ফাইনাল পরীক্ষার সময় হাতে কলমে কাজ শেখার জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে। (৫) সি-এফ-এ-পাশ করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ পাওয়া যায়। (৬) সর্বোপরি আছে দেশে-বিদেশে চাকরির সুযোগ।

পাঠক্রমের মূল উদ্দেশ্য। সি-এফ-এ অর্থাৎ চার্টার্ড ফিনানশিয়াল অ্যানালিস্টস পাঠক্রমকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রিলিমিনারি, ইন্টার এবং ফাইনাল। প্রতিটি পর্যায়ে আবার দুটো করে গ্রুপ এবং চারটি করে বিষয়। অর্থাৎ মোট ছটি গ্রুপে বারোটি বিষয়ে পাশ করার পর সি-এফ-এ উপাধি পাওয়া যেতে পারে। বাড়িতে ভালভাবে পড়াশুনো না করলে এই পাঠক্রম পাশ করা শক্ত। তবে ইনস্টিটিউট থেকে নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে প্রয়োজনীয় স্টাডি মেটেরিয়াল পাঠানো হয়। এ ছাড়া মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, নয়াদিল্লি, কলকাতা এবং ত্রিবান্দ্রাম শহরে কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
প্রতি বছর এপ্রিল এবং অক্টোবর মাসে প্রিলিমিনারি, ইন্টার এবং ফাইনাল পর্যায়ের পরীক্ষা নেওয়া হয়।

পড়াশোনার খরচ

তিন বছরের এই পাঠক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের খরচপত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার। অন্যান্য পেশাদারি কোর্সের মতো এই কোর্সের খরচও প্রায় একই রকম। নিয়মাবলী এবং আবেদনপত্রের জন্য দিতে হয় ৫০ টাকা, ভর্তি পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা, ভর্তির পরীক্ষা থেকে ছাড় পাওয়ার জন্য অর্থাৎ এক্সজেম্পশন ফি ৫০ টাকা, এনরোলমেন্ট (নথিভুক্তি) ফি ৩০০ টাকা, বার্ষিক চাঁদা ১২৫ টাকা। টিউশন ফি প্রিলিমিনারি পর্যায়ে ১০০০ টাকা, ইন্টার পর্যায়ে ১১০০ টাকা এবং ফাইনাল পর্যায়ে ১২০০ টাকা। পরবর্তী পর্যায়ে ঢোকার আগেই এক কিস্তিতে এই টাকা দিতে হয়। প্রত্যেক গ্রুপে পরীক্ষার ফি ১৫০ টাকা। এ ছাড়া সি-এফ-এ-ডাইজেস্টের জন্য বার্ষিক চাঁদা ১৫০ টাকা।

আর্থিক সহায়তা

প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে যাঁরা খুব ভাল ফলাফল করেন, তাঁদের মেরিট স্কলারশিপ বা মেধাবৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যাঁরা এই বৃত্তি পাবেন তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, আলাদাভাবে আবেদন করার দরকার হয় না। বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় কোনও বিষয়ে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে পাশ করলে তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয়। উপরন্তু সি-এফ-এ-পাশ করার পর কেউ যদি আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ-ডি পাঠক্রমে ভর্তি হন তা হলে তিনি ইনস্টিটিউট থেকে ট্রাভেল গ্রান্ট বা যাতায়াতের খরচের জন্য আবেদন করতে পারেন।

অন্যান্য কার্যক্রম

ইনস্টিটিউট ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট ডিভেলাপমেন্ট বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধমতো নানা পাঠক্রমে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। যেমন : ফিনানশিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালিসিস, কর্পোরেট ফিনানশিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

পাঠ্যসূচি

প্রিলিমিনারি পর্যায়ের গ্রুপ 'এ' তে আছে দুটি বিষয়—ফিনানশিয়াল অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনানশিয়াল ম্যানেজমেন্ট। গ্রুপ 'বি' তে আছে কোয়ানটিটেটিভ মেথডস, ইকনমিক্স। ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে গ্রুপ 'সি' তে আছে দুটি বিষয় ইকনমিক লেজিসলেশন এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনটিং। গ্রুপ 'ডি' তে আছে সিকিউরিটি ইভ্যালুয়েশন এবং প্রোজেক্ট অ্যাপ্রাইজাল, প্ল্যানিং ও কনট্রোল। গ্রুপ 'ই' তে আছে অ্যাডভান্সড ফিনানশিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ফিনানশিয়াল সার্ভিসেস। ফিনানশিয়াল সার্ভিসেসের তিনটি পার্ট—লিজিং, মার্চেন্ট ব্যাংকিং এবং আদার ফিনানশিয়াল সার্ভিস। গ্রুপ 'এফ'-এ আছে ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ইন্ডিয়ান ফিনানশিয়াল সিস্টেম।

যোগাযোগের ঠিকানা

নিয়মাবলী এবং আবেদনপত্রের জন্য পঞ্চাশ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট পাঠাতে হবে—অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (সি-এফ-এ), ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড ফিনানশিয়াল অ্যানালিস্টস অব ইন্ডিয়া, রোড নং ৩, বাঞ্জারা হিলস, হায়দরাবাদ-৫০০০৩৪ ঠিকানায়। ব্যাঙ্ক ড্রাফট 'আই-সি-এফ-এ-আই'-এর অনুকূলে কাটতে হবে। অনুরোধপত্রে পরিষ্কারভাবে নিজের পুরো নাম-ঠিকানা লেখা দরকার। যাঁরা আমেরিকার ইনস্টিটিউট সম্বন্ধে আগ্রহী, তাঁদের সুবিধের জন্য ঠিকানা জানিয়ে দিচ্ছি : ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড ফিনানশিয়াল অ্যানালিস্টস, পোস্ট বক্স ৩৬৬৮, চার্লটসভিল (Charlottesville), ভার্জিনিয়া ২২৯০৩, ইউ-এস-এ।

বিভিন্ন সুযোগসুবিধে

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'স্টুডেন্ট চ্যাপটার' খোলা হয়েছে। স্টুডেন্ট চ্যাপটার নির্দিষ্ট শহরে কোচিং ক্লাস, স্টাডি সার্কেল, সেমিনার, রিফ্রেশার কোর্স প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। ফাইনাল পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের জন্য বিভিন্ন আর্থিক সংস্থায় ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। উপরন্তু পাশ করার পর ছাত্রদের কর্মসংস্থানের সহায়তার জন্য প্লেসমেন্ট সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। সি-এফ-এ-পাশ করার পর কর্পোরেট সেক্টরে ফিনানশিয়াল অ্যানালিস্ট, ফান্ডস ম্যানেজার, ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার প্রভৃতি পদের জন্য আকর্ষক বেতনের চাকরি পাওয়া যেতে পারে। ব্যাঙ্ক বা কোনও আর্থিক সংস্থায় অ্যাপ্রাইজাল এক্সিকিউটিভ, লিজিং, হায়ারপারচেজ, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, বা মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিং স্পেশালিস্টস বিভিন্ন পদে চাকরি পাওয়া সম্ভব।
কনসালট্যান্ট কিংবা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইসরের চাহিদা এখন কম নয়। সি-এফ-এ-পাশ করার পর এসব কাজ শুরু করা যেতেপারে। যারা সি-এফ-এ-পাশ করার পর গবেষণা করতে আগ্রহী তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া, কর্নেল, পিটসবার্গ, মিচিগান, জর্জিয়া, এলাবানা, ক্যালিফোর্নিয়া, মিসিসিপি, বোস্টন, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি করার সুযোগ পেতে পারেন।
ইনস্টিটিউট বিভিন্ন সময়ে নানা খবরাখবর, পড়াশুনোর বিষয় নিয়ে সি-এফ-এ- নিউজলেটার প্রকাশ করেন। ইনস্টিটিউটের আরও একটি কার্যকর পাঠক্রম হল : ডিপ্লোমা ইন বেসিক ফিনান্স। এই পাঠক্রমের মাধ্যমে উৎপাদন, বিপণন এবং কর্মী পরিচালন বিষয়ে শেখানো হয়

বারো বছর হতেই নীলাঞ্জন মা-বাবার ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে একা শুতে চাইল। বসার ঘরের ডিভানটাই তার বেশি পছন্দ। ঘেরাঘেরি নেই, নরম-নরম আর ফাঁকা। অবিনাশ আপত্তি না করলেও, নীলাঞ্জনের মা পূর্ণিমা বলেন, "না। অতবড় ঘরে একা শুতে তোমার ভয় লাগবে।"

ভয়ের কথায় নীলাঞ্জনের জিদ চেপে গেল। বলল, "আমার বন্ধু জয় একা আলাদা ঘরে শোয়। আর নীলাভ্রর মা-বাবা তো আমেরিকায় থাকেন। ওদের অতবড় বাড়িতে কেবল ওর ঠাকুমা আর কাকু। ছেলেবেলা থেকেই ও একা ঘরে শোয়। আমি পারব না কেন!"

"না, তুমি এইটে ওঠো। তারপর একা শোবে।"

"এইটে ওঠার সঙ্গে একা শোওয়ার কী সম্পর্ক?"

"অত সম্পর্ক, মানে, কারণ আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। আরও একটু বড় হও। তারপর শোবে যে ঘরে ইচ্ছে হয়।"

কিন্তু রাতের খাওয়াদাওয়া মিটতে নীলাঞ্জন নিজের বালিশ চাদর নিয়ে ও-ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরটা অন্ধকার করতেই কেমন ভয়-ভয় লাগে। মা-বাবার পাশে না শুলেও আলাদা খাটে শুতো। মাঝরাতে হঠাৎ কখনও ভয় লাগলে তাকিয়ে দেখত, বাবা-মা পাশের খাটেই শুয়ে আছেন। কিন্তু আজ হাল্কা নীল আলোটা জ্বালিয়ে রেখেও তার ভয়-ভয় করছে। ঘুম আসতে চায় না। ওপাশে বইঠাসা দু'খানা কাচের আলমারি। দেওয়ালে শিল্পীদের আঁকা দুমড়ানো শরীরের ছবি। সেগুলো এখন ঠিকই দেখাচ্ছে। হয়তো এই হাল্কা আলোটাই কারণ। নীলাঞ্জন উঠে আলোটা নেভায়। গায়ের চাদর টেনে শুয়ে পড়ে। বিছানা-বালিশে নরম আরাম। এবার নিশ্চয়ই তার ঘুম আসবে।

কিন্তু ঘুম আসছে না। কেবল এপাশ-ওপাশ। ঘরময় চাপ-চাপ অন্ধকার। বড় লাইটটা জ্বালিয়ে সে ডিক্সনের 'হার্ডি বয়েজ' পড়তে থাকে। কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পরই কেমন একটা খচ-খচ শব্দ। বই বন্ধ করে শব্দটা কোথায় অনুসরণ করার চেষ্টা করে। নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে, ওটা কি সত্যিই কোনও শব্দ? না কি রাস্তার কুকুর গা চুলকোচ্ছিল? নিঃসন্দেহ হতে চারপাশে তাকায়। বাবা ছত্তিশগড় থেকে কয়েকটি কিম্ভূত মূর্তি এনে ঘরে সাজিয়েছেন। মারিয়াবুড়ি, কচ্ছপের ছাইদানি, কাঠের মূর্তি, লম্বা সিড়িঙ্গে অবুঝমারের মা-ছেলে, পাথরের গণেশ। এগুলো তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু পিতলের ওই কবন্ধমূর্তিটা ভয়ঙ্কর। কেবল একটা মুখ। ঠিক মুখ নয়। ঘাড় থেকে লম্বা একটা মাথা। পেছনের দিকটা ফাঁকা। মাথায় ত্রিশূলের মতো ছুঁচলো দশটা কাঁটা। দুটো চোখে গোলাকার ফুটো। বিকট হাঁ-করা

কানাই কুণ্ডু

পিতলের কবন্ধমূর্তি

রাক্ষসের মতো। পেছনে লাল আলো জ্বালিয়ে বাবা প্রথম দিন সবাইকে দেখিয়েছিলেন। মা ভয়ে আঁতকে উঠলেন, "বন্ধ করো, বন্ধ করো। আমি তাকাতে পারছি না।"

বাবা আলোটা নিভিয়ে বলেছিলেন, "এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এর কারুকাজ দেখলে আর ভয় লাগে না। এটাই আমার ছত্রিশগড়ের সেরা সংগ্রহ।"

কিন্তু আজ এসব কথা তার মনে পড়ছে কেন! এসব তো অনেকদিন আগের কথা। আসলে সে একা শুতে ভয় পাচ্ছে।

আবার পাতা উলটে পড়া শুরু করে। ফ্র্যাঙ্ক হার্ডি এখন সেই রহস্যময় পোড়ো বাড়িটায় ঢুকে পড়েছে। মনেই হয় না, সেখানে কোনও মানুষ থাকে। মাকড়সার জাল, ভাঙা পাখির ডিম, মেঝেময় জমাট ধুলো। কিন্তু জুতোপরা পায়ের ছাপ দেখা যায়। সেই ছাপ অনুসরণ করে ফ্র্যাঙ্ক এগিয়ে যায়। হঠাৎ...

খচ-খচ শব্দটা এবার বেশ জোরেই হচ্ছে। সে ওপরে তাকায়। সরাসরি কবন্ধমূর্তিটায় চোখ পড়ে। সেটা এখন তার দিকেই অন্ধকার চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে। দেওয়ালে লেপটে থাকলেও নড়ছে-চড়ছে। কিছু কি বলছে! কথা বলার মতোই কেমন একটা ফিস-ফিস আওয়াজ। কিন্তু নীলাঞ্জন তো ছত্তিশগড়ি ভাষা জানে না। বাবা জানেন। বাবাকে কি ডাকবে নীলাঞ্জন? কিন্তু সে তো ভয়ে উঠতেই পারছে না। অথচ মূর্তিটা কটকটে চোখে তাকে দেখছে। দেখতে-দেখতে সেটা যেন মানুষের মতো হয়ে ওঠে। আর পিতলের মনে হয় না। গলাকাটা একটা মানুষের মাথা! শরীর নেই, হাত-পা নেই, কেবল একটা মাথা। আর সেই মাথায় খোবলানো চোখের চকচকে চাউনি। হিস-হিস ফিস-ফিস শব্দ। মাথার কাঁটাগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। খুব ভয় করছে তার। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। ঘামে শরীর ভিজছে। ওপরে জড়ানো চাদরটাও ভিজে উঠছে। অনেক সাহস নিয়ে চাদরটা ছুঁড়ে সে উঠে পড়ল। দরজার দিকে এগিয়ে খিল খুলতে গিয়ে একবার পেছন ফিরে দেখল। মূর্তিটা আগের মতোই দেওয়ালে স্থির। দু'চোখের ফুটোয় অন্ধকার। ছবির মতো স্তব্ধ। ঠিক সেই আগের মতো শান্ত, নিরীহ।

নিজেকে বড় বোকা মনে হল। যদি সত্যিই সে দরজা খুলে মা-বাবাকে ডেকে বসত! বলত, ওই মূর্তিটা নড়ছে, কথা বলছে। আমার ভয় করছে। আর কি তাকে মা এ-ঘরে শুতে দিতেন! বাবাও তাকে বোকা বলে নিজেদের ঘরে ডেকে নিতেন।

ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে নীলাঞ্জন। চাদরটা টেনে নেয়। গায়ের জামাটা কেমন ভেজা-ভেজা। সে নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে। একা শুলে প্রথম দিন হয়তো এমন মনে হয়। চোখ বুজে শুলেই ঘুম আসবে।

মূর্তিটার দিকে আর তাকাল না নীলাঞ্জন। নানারকম ভাবনার তোলপাড় তাকে জাগিয়ে রাখে। আধো জাগা আধো ঘুমে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে-থাকতে কখন ঘুম এসেছিল ঠিক মনে নেই। হঠাৎ দরজায় দুমদাম শব্দে সে চমকে জেগে উঠল। বাইরে বাবার গলা, "অ্যাই নিলু, ওঠ। স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!"

দরজা খুলে বেরোতেই মা বললেন, "খুব আরামে ঘুমোলি বুঝি। এত ডাকাডাকিতেও ঘুম ভাঙে না!"

স্কুল থেকে ফিরে দুপুরে স্নান-খাওয়া। দুপুরটা ক্লাসের পড়া তৈরির সময়। পরের দিন আবার ম্যাথসের হোম-ওয়র্ক। কিন্তু দু' লাইন অঙ্ক করতে না করতেই ঝিমুনি আসে। বিকেলে ক্রিকেট প্র্যাকটিস। ঘুম এলে খেলা মাটি। অনেক চেষ্টা করেও ঘুম এড়ানো গেল না। যখন ঘুম ভাঙল, সন্ধে নেমেছে। কিছুই করার থাকে না। একা-একাই খানিক ঘুরে বেড়ায়। ফিরে এসে আবার ক্লাসের পড়া তৈরি করতে হয়।

কিন্তু রাত্রে ঘরের দরজাটা বন্ধ করতেই মূর্তিটার কথা মনে পড়ল। এবং আজও সে এ-ঘরে একা। আলোটা নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। এত অবসাদ, এত ক্লান্তি, তবু ঘুম আসে না। না আসুক, সে চোখ বুজে শুয়ে থাকবে। আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু মনের ভিতরে মন হেঁটে বেড়ায়। গভীর জঙ্গল, লম্বা-লম্বা গাছপালা, কাঁটাঝোপ। মাঝখানে পায়েচলা সুতোর মতো রাস্তা। দু'পাশে কেবল ঘন গাছের সারি, শুকনো পাতা। ঝরনা থেকে ঝরঝর জল পড়ার শব্দ। এদিকে-ওদিকে পাহাড়ের জটলা।

কোনও পাহাড় গাছপালায়ঢাকা, যেন চাকবাঁধা মেঘ। কোনও পাহাড় একেবারে ন্যাড়া। কেবল কালো পাথরের চট্টান। পাহাড় পেরোলে দূরে ছবির মতো গ্রাম। পাতা-ঘাসে ছাওয়া ছোট ঝুপড়ি ঘরের সারি। পাশে কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলে নদী। জঙ্গল সীমানা পার হলে একটা গভীর খাদ। নীলাঞ্জন হেঁটে চলে। আর ওই খাদের পাশ দিয়ে এগোতেই দেখতে পায়, ভিতরে ওই কবন্ধমূর্তি।

আর ঠিক তখনই দেওয়ালে শব্দ হয়, ঠক ঠক, খচ। অবাক হয়ে নীলাঞ্জন চোখ খুলে তাকায়। ঘরের আলো নেভানো থাকলেও খোলা জানালা দিয়ে আসা রাস্তার আলোয় সব দেখা যায়। এমনকী সেই কবন্ধমূর্তিটাও। এবং সেটা এখন নড়ছে। কথা বলছে। একটু অস্পষ্ট, কিন্তু বোঝা যায়।

কিন্তু আজ তো রাত তেমন গভীর হয়নি। রাস্তায় কারা যেন কথা বলতে-বলতে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে জোরে গাড়ি ছুটে যাওয়ার শব্দ। কবন্ধটার সেদিকে কোনও খেয়াল নেই। শব্দ করে নড়ে উঠছে। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। অন্ধকার চোখ দুটোয় এখন লাল আগুন দপদপ করছে। করাতের মতো দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে লাল আভা। ও কি রক্ত!

আজও ভয়ে তার শরীর হিম হয়ে এল। আর ঘুম এল না।

সকলের আগেই সে উঠে পড়ল। তখনও ভাল করে সকাল হয়নি। রাস্তায় দরোয়ানজির গাড়ি ধোওয়ার শব্দ। কাজের মেয়েদের, সকালের ডিউটির লোকজনের চলাচল শুরু হয়েছে। ঘড়ঘড় শব্দে কয়েকটা ট্যাক্সি গড়িয়াহাট মোড়ের দিকে এগিয়ে গেল। সবার আগে ডালিয়া ওঠে। ডালিয়া মায়ের কাজে সাহায্য করে। ফিল্টারে জল ভরে, চৌবাচ্চার কল খুলে দেয়। সকালের চা-টোস্ট বানায়। তারপর বাবা ওঠেন। শব্দ করে মুখ-চোখ ধোন। বারান্দার টেবিলে লিখতে বসেন।

নীলাঞ্জন দরজা খুলে বাইরে এল। মুখ ধুয়ে টেবিলে এসে বসল। ডালিয়া বাবাকে চা এবং ওকে দুধ-বিস্কুট দিয়ে গেল। ওকে দেখে বাবা বললেন, "হ্যাঁ, এইরকম ভোরবেলা উঠবি। এই সময়ে পড়াশোনা ভাল হয়।"

"আচ্ছা বাপি, ওই কবন্ধটা যেখান থেকে এনেছ, সেখানে খুব জঙ্গল, তাই না?"

"মধ্যপ্রদেশের সব জঙ্গলই গভীর।"

লিখতে-লিখতে অবিনাশ জবাব দেন।

"দুটো পাহাড় পার হলে সেই গ্রাম?"

"ওদিককার গ্রামে পাহাড়, টিলা থাকে।"

"পাহাড়টার গায়ে একটা ঝরনা আছে। আর সেটা একদম ন্যাড়া পাহাড়।"

"ওখানকার অনেক পাহাড় থেকেই ঝরনা বেরিয়ে নদী তৈরি হয়েছে।"

"ওই জঙ্গলসীমার শেষেই একটা গভীর খাদ। আর ওই কবন্ধটা তুমি খাদের ভেতর থেকেই পেয়েছ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তুই এসব জানলি কেমন করে? একথা তো তোদের কোনওদিন বলেছি বলে মনে হয় না?" লেখা থামিয়ে অবিনাশ বিস্ময় প্রকাশ করেন।

"এমনি, আমার মনে হল।"

"হঠাৎ এমন মনে হয় নাকি! আর মনে হওয়ার সঙ্গে সত্যি ঘটনা এমন মিলে যায়!"

সেদিনও একা ঘরে নীলাঞ্জন দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আজ তার শোওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাবা আর কথা না বাড়ানোয়, তার ভয়ের ব্যাপারটা জানাতে পারেনি। অথচ একা শোওয়ার ইচ্ছেই ছিল না। আজ সে আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। কবন্ধটার দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে। সে আজ ঘুমোবে না। মূর্তিটাকে লক্ষ করবে। আজও কোনও ঘটনা ঘটলে, বাবাকে জানাবে। কিন্তু বাবা বললেন, তার মনে হওয়া ঘটনা সত্যের সঙ্গে মিলে গেছে। ওই একইরকম পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা গ্রাম, ঝরনা, নদী, পাহাড়ি খাদ আর খাদের ভিতরে ওই মূর্তির কথা তার মনে হবে কেন? সে তো কোনওদিন ওই জায়গায় যায়নি। কেবল মনের ভাবনায় হেঁটে গেছে। এখনও তার স্পষ্ট মনে পড়ছে। কেন তার এমন মনে হল?

খস-খস, খট, টুং।

চমকে ওপরে তাকায় নীলাঞ্জন। হ্যাঁ, মূর্তিটা নড়ে উঠল। এখন স্থির। ওই তো আবার নড়ছে। ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে তার। এখনই হয়তো ওর চোখ জ্বলে উঠবে। করাতের মতো দাঁতের ফাঁক দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়বে। না, সে আর শুতে পারল না। বালিশটা নিয়ে কোনায় পাতা শোফায় চাদর মুড়ি দিয়ে বসল। বারবার কবন্ধটার দিকেই নজর চলে যায়। আর ঘুম আসে না। ভাবে, বাবাকে ডেকে সব দেখাবে। কিন্তু মূর্তিটা যদি তখন আবার স্থির হয়ে যায়!

সকালে উঠতে বেশ দেরি হয়ে যায়। মা তাকে দেখেই বলেন, "কী রে, তোর চোখ-মুখ

এমন বসে গেছে কেন ? নিশ্চয়ই তুই রাত্রে ঘুমোসনি। কী শুকনো চেহারা হয়েছে তোর ?"

জবাব না দিয়ে নীলাঞ্জন হাত-মুখ ধুতে যায়। টেবিলে এসে বসে। তার দুধ এবং মায়ের চা আসে। বাবা আগেই উঠেছেন। তাঁরও দ্বিতীয় প্রস্থের চা। মা বলেন, "তোর কি একলা শুতে ভয় লাগে ? রাতে ঘুম হয় না ?"

কথাটা কীভাবে বলবে ঠিক করতে পারে না নীলাঞ্জন। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে পূর্ণিমা উদ্বিগ্ন। "তা হলে তোর চেহারা এমন কেন ? দেখি জ্বরটর হয়েছে কি না।" বলে কপালে বুকে হাত বোলান।

নীলাঞ্জন লজ্জা পেয়ে যায়। বাবার সামনে আদর-টাদরে তার খারাপ লাগে। বলে, "সরো তো !"

"না, তুই ক'দিন এ-ঘরেই শুবি। আবার ক'দিন পরে ওঘরে যাস। এভাবেই অভ্যেস হয়ে যাবে।"

মনে-মনে এটাই চাচ্ছিল নীলাঞ্জন। বলে, "আচ্ছা।"

রাত্রে মায়ের ঘরেই শুল। বাবা লাইট নিভিয়ে দিতে ঘর অন্ধকার। এবং ঠিক তখনই তার কবন্ধমূর্তিটার কথা মনে পড়ল। অবশ্য আজ আর ভয় করছে না। মা-বাবা কথা বলছেন। এর মাঝে সে হঠাৎ বলে, "বাপি, তুমি ওই মূর্তিটা কি কুড়িয়ে এনেছিলে ?"

"কোন মূর্তি ?"

"ওই যে গলাকাটা কবন্ধটা ?"

"দুই-ই বলতে পারিস। কুড়নো এবং কেনা।"

"এমন বলছ কেন ?"

"গ্রামের বাইরে একটা গুহায় মূর্তিটা পড়েছিল। আমার সঙ্গে ওই গ্রামেরই একটা ছেলে ছিল, ছবিলাল। সেই আমাকে গ্রাম দেখাচ্ছিল। মূর্তিটা আমি দেখতে পাই। আগ্রহভরে হাতে নিতেই, ছবিলাল হাঁ-হাঁ করে তেড়ে এল। হাতে নেবেন না বাবুজি, খতরা আছে।"

"খতরা মানে কী ?"

"বিপদ।"

"তুমি লুকিয়ে নিয়ে এলে ?"

"না, ছবিলালকে কুড়ি টাকা দিয়ে, আসার সময়ে ব্যাগে ভরলাম।"

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তবু স্বস্তি পায় না নীলাঞ্জন। ঘুম আসে না। বাবা আবার কথা শুরু করেন। "তুই হঠাৎ এত কথা জানতে চাস কেন ? সেদিন সকালেও কীসব বলছিলি।"

"কবন্ধটা রাত্তিরে জেগে ওঠে বাপি। নড়া-চড়া করে, নানারকম শব্দ হয়।"

"দূর পাগল, তুই স্বপ্ন দেখেছিস।"

"না বাপি, আলো জ্বালিয়ে আমি দেখেছি।"

"ঘুমিয়ে, না জেগে ?"

"সত্যি বলছি বাপি।"

"রোজ রাত্রে এমন হয় ?"

"হ্যাঁ, রোজ।"

"তুই ঠিক বলছিস ?"

"একদম ঠিক।"

তড়াক করে উঠে পড়েন অবিনাশ। ঘরের আলো জ্বালান। ড্রেসিং টেবিলে কী যেন খোঁজেন। পূর্ণিমাকে জিজ্ঞেস করেন, "ও-ঘরের চাবিটা কোথায় ?"

"না, তাই বলে তোমার ও-ঘরে গিয়ে শুতে হবে না। কিসের থেকে কী হয়, কেউ বলতে পারে ! ওই বিদঘুটে মূর্তিটা তুমি কালই ফেলে দিও।"

"ফেলে দেব কেন ? তার আগে যাচাই করে নেব। চাবিটা কোথায় বলো !"

"তোমায় বীরত্ব দেখাতে হবে না, শুয়ে পড়ো।"

"নিলু হয়তো পুরো ব্যাপারটাই ভুল দেখেছে। ওই ভুল থেকে একটা মিথ্যে ভয় ওর মধ্যে দৃঢ় হয়ে থাকবে। সত্যতা যাচাই করা দরকার। চাবিটা কোথায় বলো ?"

বালিশের নিচ থেকে পূর্ণিমা চাবিটা বের করে দেন। নীলাঞ্জন বলে, "ভুল নয় বাপি। তুমি ও-ঘরে শুয়ো না। ঘুমোতে পারবে না।"

ঘুমিয়েই পড়েছিলেন অবিনাশ। প্রথমটা একটু গা-ছমছম ভাব। তারপর কখন ঘুম এল খেয়াল নেই। যখন ঘুম ভাঙল সকাল।

কোনও শব্দ বা অস্বস্তি ব্যাঘাত ঘটায়নি। বরং হাত-পা ছড়িয়ে একা বিছানায় তোফা ঘুম। পূর্ণিমা সকালে জিজ্ঞেস করেন, সত্যি কিছু দেখেছেন কি না। নীলাঞ্জন বলে, "কাল রাত্রে তুমি বোধ হয় ঘুমোতে পারোনি।"

"অবিনাশ বলেন, "কাল তো শোওয়ার পরেই ঘুম এসে গেল। ঘুম না এলে এমন আবোল-তাবোল মনে হয়। আসলে কিছুই না। তবুও আজকের রাতটাও ও-ঘরে শোব ভাবছি।"

রাত্রে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে অবিনাশ ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। আলো জ্বালিয়ে বইপড়া শুরু করলেন। রাত্রি গভীর। দূরে কোথাও বেড়াল ঝগড়া করছে। আরও দূরে বালিগঞ্জ স্টেশনের ওপর দিয়ে মালগাড়ি গমগম শব্দে চলে যাচ্ছে। আর বসে থাকা যায় না। আলো নেভানোর সময়ে একবার মূর্তিটার দিকে তাকালেন। শুয়ে পড়লেন অবিনাশ। রাস্তার ক্ষীণ আলোয় মূর্তিটাকে দেখা যায়। প্রায় মাথার ওপর। হয়তো এটাই নিলুর ভয় পাওয়ার কারণ। চোখের পাতা প্রায় বুজে আসছিল। হঠাৎ খস-খস খুটখাট শব্দ। চমকে উঠলেন অবিনাশ। তাই তো, মূর্তিটা যেন একটু নড়ছে। এবার কি তা হলে ওটা কথা বলবে? কিন্তু এখনই আগের মতো স্থির। তবু অবিনাশ তাকিয়ে থাকেন। এবং তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই আবার সেটা নড়ে ওঠে, ঠক ঠং। মূর্তিটা কি সত্যিই কোনও দৈব অভিশাপ! ছবিলাল তো তাই বলেছিল। কে গড়েছে ওই মূর্তি কেউ জানে না। যে ওকে পুজো করত, মারা গেছে। তারপর যার ঘরেই মূর্তিটা গেছে নানা অমঙ্গল দেখা দিয়েছে। শেষে গাঁয়ের লোক, কবন্ধটাকে খাদে ফেলে দিয়ে গেছে।

এমন কী অমঙ্গল ডেকে আনে এই মূর্তি যে কারণে দামি হওয়া সত্ত্বেও তাকে গ্রামের বাইরে ফেলে দেয়। এ কি সংস্কার। অজ্ঞান অবুঝ আদিবাসীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস! না কি সত্যিই কোনও অলৌকিক রহস্য? ব্যাপারটা একটু দেখা দরকার।

সকালে উঠেই অবিনাশ বলেন, "আমি কালই রায়পুর যাব। ওখান থেকে কাঁকের। কাঁকেরের পাহাড়ি অঞ্চলে ছবিলালের গ্রাম। মূর্তিটা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা চাই। তোমরা ক'দিন ওই ঘরে তালা দিয়ে রেখো।"

বাবা বাড়িতে না থাকায় নীলাঞ্জনের ভয় বেড়ে যায়। এখন মা, ডালিয়া এবং সে নিজে পাশের ঘরে শোয়। এ-ঘরে মূর্তির নড়াচড়া বা কোনও আওয়াজ আসে না। তবু রাত্রে ভয়-ভয় লাগে। প্রায় চারদিন হল বাবা নেই। মা চিন্তায় থাকেন।

সেদিন রাত সাড়ে দশটায় টিভিতে একটা ভাল ছবি হচ্ছিল। বসার ঘরেই টিভি। কাজেই সবাই এ-ঘরে। ছবিটা বেশ জমে উঠেছে। ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। মা কিন্তু মাঝে-মাঝে সেই মূর্তিটার দিকে তাকাচ্ছেন। এক সময়ে বলেন, "চল নিলু রাত হয়েছে। আমরা ও-ঘরে শুয়ে পড়ি।"

"আর-একটু বোসো না মা। কাল তো শনিবার। স্কুল ছুটি। দেরি হলে অসুবিধে নেই।"

সে আবার টিভির পরদায় মগ্ন হয়। হঠাৎ মা বলেন, "ওই দ্যাখ নিলু।"

মায়ের চোখ অনুসরণ করে নীলাঞ্জন কবন্ধটার দিকে তাকায়। বেশ জোরে নড়ছে। এত জোরে কোনওদিন নড়তে দেখেনি। এত শব্দও হয়নি। ওটা কি বুঝতে পেরেছে বাবা বাড়িতে নেই? মূর্তিটার মাথার ভেতর থেকে শুঁড়ের মতো কী যেন বেরিয়ে আসে। মা ভয়ে চিৎকার করে চোখে-মুখে হাত চাপা দেন। ডালিয়া আঁতকে উঠে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। নীলাঞ্জনও পালাচ্ছিল। এমন সময়ে একটা চড়ুইয়ের বাচ্চা মূর্তিটার মাথায় পা রেখে বসে। শরীর নাড়ায়। মূর্তিটাও নড়তে থাকে।

দাঁড়িয়ে পড়ে নীলাঞ্জন। কেমন হালকা হয়ে যায় শরীর। চড়ুই-বাচ্চাটার তখনও ভালভাবে ডানা গজায়নি। ছোট-ছোট পালকে ঢাকা শরীর। কুতকুতে গোল চোখ নিয়ে দেখছে। চিরিক-চিরিক শব্দে ডাকছে। নীলাঞ্জন বলে, "মা তাকিয়ে দ্যাখো।" পূর্ণিমা চোখ খোলেন না। সে আবার বলে, "তাকিয়ে দ্যাখোই না একবার।"

পূর্ণিমা চোখ মেলে তাকান। বলেন, "এই আপদ ভেতরে ঢুকল কেমন করে?"

"মূর্তির মাথাটা দেওয়ালে সাঁটা হলেও গলাটা তো ফাঁপা। ওই ফোকর দিয়ে চড়ুই ঢুকে বাসা বানিয়েছিল। তুমি সকালেই বাবাকে ফিরে আসতে টেলিগ্রাম করে দিও।"

ডালিয়া বলে, "আমি তো বিছানায় পালক, কাঠি পড়ে থাকতে দেখেছি। ঝাঁট দিয়ে রোজ পরিষ্কার করে দিই।"

নীলাঞ্জন বলে, "এবার তোমরা ও-ঘরে যাও মা। আমি এ-ঘরেই শোব। আমার আর ভয় করবে না।"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভীষণ মজা

ত্রিভুজ এবং বৃত্ত দিয়ে আমরা অনেক ভাবে আঁকার চেষ্টা করলাম। এবারেও দ্যাখো একই ছবিতে কেমন ভিন্ন ভঙ্গিমা ফুটে উঠেছে। এরকম তোমরা নিজেরাও আঁকার চেষ্টা করতে পারো। ভীষণ মজা পাবে।

হাসিখুশি — শতদল

বৃদ্ধ প্রতিবেশী, "তোমার কত বয়স হল সমু?"
সমু, "ছ' বছর।"
বৃদ্ধ, "ছ' বছর বয়স, আর তুমি কিনা আমার ছাতার সমানও লম্বা নও।"
সমু, "তোমার ছাতার কত বয়স?"

বাবা, "তোমাকে মারতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে রাজু।"
রাজু, "তুমি নিজেকে অত কষ্ট দিও না তা হলে।"

মা, "ঘুম থেকে ওঠো মিকি, দ্যাখো, পাখিরা কত সকালে উঠে পড়েছে।"

মিকি, "আমাকে যদি ওরকম কাঠি আর খড় দিয়ে বানানো বাসায় ঘুমোতে হত, তবে দেখতে, আমিও অমন সকাল-সকাল উঠে পড়তাম।"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

টিনটিন * হার্জ

ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ ! আমি সানন্দে পৃথিবীর বলিষ্ঠতম লোকটিকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি··· এক এবং অনন্য বলিভার !···দেখুন, তাঁর বিস্ময়কর শক্তি···
বলিভার
এক হাতের হেঁচকায় হাসি মুখে পাহাড় তোলাই মিঃ বলিভারের বৈশিষ্ট্য···আসুন, মিঃ বলিভার !
উফ্ !
?
?!?!
এটা কি মজা হচ্ছে, অ্যাঁ ?
দয়া করে শুনুন, সার··· আমার দোষ নেই··· বুঝতে পারছি না··· কেউ··· ওজনটা পালটে দিয়েছে !
তুমি কিছু বুঝতে পারছ, টিনটিন ?
কিচ্ছু না ! শুধু জানি কেউ আমাদের পায়ে জলে-ভাসা ডাম্বেল বেঁধে দিয়েছিল !
এগিয়ে চলো, ডিক !··· ওখানে জলের ওপরে কিছু ভাসছে···
পুলিশ ৩৪
তাজ্জব !··· অবিশ্বাস্য !··· ওদিকে তাকিয়ে দ্যাখো ! ডাম্বেলে বাঁধা একটা লোক জলে ভাসছে !
পুলিশ ৩৪
পুলিশ ৩৪
এখন বুঝতে পেরেছি··· কাঠের তৈরি ডাম্বেল···
অফিসার, জলদি, আমাদের আরও লোক দরকার !··· গুণ্ডারা আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিল। ওদের এক্ষুনি গ্রেফতার করতে হবে ! আমি ওদের ডেরা চিনি !

আমেরিকায় টিনটিন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাটম্যান
ভাইঝিকে (আসলে জাল) তাক লাগাতে খানসামা আলফ্রেড মনিব ব্রুস ওয়েনের সম্মতিতে তাঁর সঙ্গে জায়গা বদল করেছে, আর প্রতারণা সন্দেহ করে ব্রুস ব্যাটম্যানের ভূমিকা নিয়েছে⋯
ব্যাটম্যান আর রবিন ! ওরা জেনে গেছে ! 'কাকা' আমাদের ধাপ্পা টের পেয়ে ওদের ডেকে এনেছে ! আমরাই ধোঁকা খেয়েছি !
থামো, গয়টি ! তোমরা গুলি চালাও !
'ধাপ্পা টের পেয়ে'⋯ 'ধোঁকা'⋯ 'গয়টি' ?? !! ও আদৌ আমার ভাইঝি নয় ! হায় ভগবান !
আমার পায়ে স্প্রিং আছে, তাই না ?
উউফ
বনবনবন
জোচ্চোরের দল ! এবার জেলে ঘানি টানবে !
কী করে কাজ করতে হয় মেয়েদের কাছ থেকে শেখো ! চার্লি, এই সুযোগ ! গুলি চালাও !
হঠাৎ গুণ্ডাদের মাথার ওপর কী যেন এসে তাদের ওপরে টেনে তুলতে লাগল !
এই !
আমরা শূন্যে উঠে যাচ্ছি !
গুণ্ডারা শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বকের জালে গিয়ে ঠেকল ! তাদের জুতো: পেরেক, চাবির গোছা, বেল্টের বাকল্ আর জামার বোতামে চুম্বকের টান !
উহ্ ! চোখে দেখছি না !
নামিয়ে নাও !
হ্যাঁ, স্থানীয় জেলে কিছু রদ্দি জিনিস পাঠাব ঠিক করেছিলাম !
আলফ্রেড !
পরে⋯ জোচ্চোররা জেলে গেলে⋯
আজ কাজে ত্রুটি হলে মাফ করবেন, স্যার ! আমার আসল ভাইঝিকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়েছি ! তক্ষুনি কাজে ফিরে গিয়ে খেতে দিচ্ছি !
মানে⋯এটা কী, স্যার ?
দিন এখনও শেষ হয়নি, আলফ্রেড ! দিনের শুরুতে তুমি ছিলে কর্তা আর আমি খানসামা ! সেইভাবেই শেষ করা যাক ! খানা তৈরি স্যার !
স্যার⋯ !
পেট ভরে খান, স্যার !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পাহাড়ের আড়ালে সূর্য উঠেছে একটু আগে। এখনও রোদ চড়া হয়নি, রাজপুরীর সামনের চত্বরটিতে ছড়িয়ে আছে পাতলা ছায়া। এখানে অনেক গাছে পাখিরা জেগে উঠে ডাকাডাকি করে অন্যদের জাগাচ্ছে। দূরে শোনা যাচ্ছে জলপ্রপাতের শব্দ।

রাজকুমার তীক্ষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছে একটি গাছের নীচে। সেই গাছের অনেক ডালপালা ছড়ানো। মল্লপাল এবং দলের অন্য লোকজনরা দাঁড়িয়ে আছে দূরে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল, বাহুক এখনও আসেনি। অনেক দর্শক অবশ্য এসে গেছে এরই মধ্যে।

হঠাৎ সানাই আর কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠল। রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল একটি দল, তার মাঝখানে কালো ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন বৃদ্ধ রাজা। প্রজারা রাজার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

একটি গাছের নীচে ঘোড়া থেকে নামলেন রাজা। তারপর তিনি হাতছানি দিয়ে তীক্ষ্ণকে কাছে ডাকলেন।

রাজকুমার তীক্ষ্ণ কাছে এগিয়ে এসে হাত জোড় করে রাজাকে প্রণাম জানাল।

রাজা মৃদু স্বরে বললেন, "জয় হোক। দীর্ঘজীবী হও, কুমার। আমি শুনলাম, তুমি আমার সেনাপতি বাহুককে কাপুরুষ বলে অপমান করেছ। কেন এমন দুঃসাহস দেখালে তুমি? বাহুক তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়, তোমার তুলনায় অনেক শক্তিমান। এই রাজ্যের হয়ে সে তিনটি যুদ্ধ জয় করেছে। তোমাকে জয় করতে তার এক মুহূর্তও লাগবে না।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "বেশ তো! আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি যদি জয়ী হতে পারেন, তা হলে তাঁর গৌরব আরও বাড়বে। আপনার রাজ্যের সুনাম হবে!"

রাজা বললেন, "তোমাকে হারিয়েই তো সে থামবে না। তুমি তাকে কাপুরুষ বলেছ, তোমাকে সে হত্যাও করবে! তোমার এত কম বয়েস, তবু তুমি মরতে চাও কেন? কী তোমার দুঃখ? কেন তুমি নিজের রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে-রাজ্যে ঘুরছ?"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ হেসে বলল, "আমার কোনও দুঃখ নেই। আমার খুব তাড়াতাড়ি মরে যাবারও ইচ্ছে নেই। আমি দিগ্বিজয়ী হবার জন্য

রাজ্য ছেড়ে বেরিয়েছি।"

রাজা বললেন, "তোমার অভিজ্ঞতা কম, তাই তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার যতই দক্ষতা থাকুক, বড়-বড় বীরদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে তোমার যে-কোনও সময় মৃত্যু হতে পারে। একজনকে তুমি যুদ্ধে হারালেও তার সঙ্গী-সাথীরা তোমাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে। আমি তাই এই যুদ্ধ বন্ধ করতে এসেছি। সেনাপতি বাহুক এখনই এসে পড়বে। তুমি তার সামনে ক্ষমা চাও! বয়েসে বড় একজন যোদ্ধার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। তুমি ক্ষমা চাইলেই মিটমাট হয়ে যাবে। তারপর তুমি আমাদের অতিথি হয়ে কিছুদিন থাকো।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ উদ্ধতভাবে বলল, "ক্ষমা চাওয়া তো দূরে থাক, সেনাপতি বাহুক যদি এখানে আসতে আর দেরি করেন, তা হলে আমি সবার সামনে তাঁকে আবার কাপুরুষ বলব। এই রাজ্যের সকলকেই কাপুরুষ বলব!"

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "হায় বালক! তবে তোমাকে মরতেই হবে দেখছি!"

সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল অনেক ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। একদল অশ্বারোহীর সঙ্গে এসে উপস্থিত হল সেনাপতি বাহুক। তার সঙ্গে স্বর্ণখচিত পোশাক। মাথায় কার্তিক ঠাকুরের মতন মুকুট। তার সঙ্গীদেরও বেশ বলবান যোদ্ধা বলে মনে হয়।

বাহুক ঘোড়া থেকে নেমে রাজাকে প্রণাম জানাবার পর গম্ভীরভাবে বলল, "মহারাজ, আজ একটু পরেই আমাকে পাহাড়পুরে যেতে হবে। তার আগে আপনার সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসতে হবে। এই বালকটির যুদ্ধসাধ আমি খুব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিচ্ছি। তারপর সব কাজ সারব।"

এর পর সে জনতার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "এই অসভ্য ছোকরাটি আমাকে অপমান করেছে, আমাদের রাজ্যের অপমান করেছে। আমি একে শাস্তি দেব। এর বয়েস কম বলে অনেকের দয়া হতে পারে। কিন্তু একে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করবেন না আমাকে। এই হতভাগা প্রাণ নিয়ে এ রাজ্য ছেড়ে যেতে পারবে না।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল।

এর পর শুরু হল যুদ্ধ। রাজকুমার তীক্ষ্ণর চেহারাটা ছোটখাটো বলে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রথম থেকেই তাকে অবহেলার চোখে দেখে। তাকে পরাজিত করা যেন অতি সহজ কাজ। কিন্তু রাজকুমার তীক্ষ্ণর হালকা শরীরটি এত দ্রুত ঘুরতে পারে যে, তাকে ধরাছোঁওয়াই যায় না। তা ছাড়া সে অনেক উঁচুতে লাফাতে পারে। হঠাৎ-হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। লাফিয়ে গাছের ডাল ধরে ঝোলে।

সেইরকমই একবার গাছের ডাল থেকে রাজকুমার তীক্ষ্ণ একটা লাথি মারল বাহুকের মুখে। বাহুক সেই আঘাতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। রাজকুমার তীক্ষ্ণ ঝুপ করে তার সামনে এসে পড়ে বলল, "তুমি নিজেই জানিয়েছ, কেউ কারুকে ক্ষমা করবে না। উঠে দাঁড়াও! শুয়ে থাকা অবস্থায় আমি কাউকে হত্যা করি না। ওঠো!"

সেনাপতি বাহুক অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল। তার মাথা ঘুরছে। তবু

সে খুব জোরে একটা কোপ মারতে গেল। ঝট করে সরে গিয়ে রাজকুমার তীক্ষ্ণ তার তলোয়ারের অর্ধেকটা বিঁধিয়ে দিল বাহুকের বক্ষে। বাহুক আর একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না, ঢলে পড়ল মৃত্যুর মুখে।

রক্তমাখা তলোয়ারটা টেনে বার করে উঁচুতে উঠিয়ে রাজকুমার তীক্ষ্ণ চেঁচিয়ে বলল, "আমার সঙ্গে লড়াই করতে আর কেউ চায়? আর কেউ আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজি আছে?"

সবাই বিস্ময়ে হতবাক। কেউ কোনও সাড়া দিল না।

তারপর হঠাৎ বাহুকের অশ্বারোহী দল হুঙ্কার দিয়ে উঠল এক সঙ্গে। অস্ত্র তুলে সেই সময় প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন যোদ্ধা ছুটে আসতে লাগল রাজকুমার তীক্ষ্ণর দিকে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের এরকম নিয়ম নয়। একসঙ্গে এতজন মিলে একজন মাত্র যোদ্ধাকে আক্রমণ করে না। রাজকুমার তীক্ষ্ণ একবার তাকাল বৃদ্ধ রাজার দিকে। রাজা কটমট করে তাকিয়ে আছেন। তিনিও আগে থেকেই জানতেন, বাহুক পরাজিত হলে তার দেহরক্ষীরা সবাই একসঙ্গে আক্রমণ করে এই স্পর্ধিত কুমারকে হত্যা করবে।

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে গিয়ে রাজার কালো ঘোড়াটার পিঠে চড়ে বসল। আর কোনও দিকে পালাবার পথ নেই, তাই সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল রাজবাড়ির দিকেই। সেদিক থেকেও তেড়ে আসছে একদল যোদ্ধা। অন্য কোনও উপায় না দেখে রাজকুমার তীক্ষ্ণ সেই ঘোড়াসুদ্ধু ঝাঁপিয়ে পড়ল জলপ্রপাতের মতন অতি খরস্রোতা নদীতে।

তারপর তাকে দেখা গেল না। হায়-হায় করে উঠল জনতা।

সেই দুরন্ত স্রোতের টানে অনেকখানি ভেসে গেল রাজকুমার তীক্ষ্ণ, তবু তার মৃত্যু হল না। এক সময় সে উঠে পড়ল নদীর অন্য পাড়ে। পাশেই একটি নিবিড় বন। সেই বনের মধ্যে শুয়ে পড়ল সে। জেগে ওঠার পর সে কালো ঘোড়াটিকে আর দেখতে পেল না।

পরদিন বন থেকে বেরিয়ে কিছু দূর যাবার পর সে একটি নগরের সন্ধান পেল। লোকজনের সঙ্গে কথা বলে বুঝল, এটা ভোজ রাজ্য নয়। এ এক অন্য রাজ্য, এর নাম গালবদেশ। এর রাজধানীর নাম যুধাখেরি।

রাজকুমার তীক্ষ্ণ রাজধানীর উদ্দেশে রওনা দিল। ভোজ রাজ্যের পর তার এখানেই আসার কথা ছিল। ভোজ রাজ্যের অশ্বারোহীরা তাকে এখানে তাড়া করে আসতে পারবে না।

রাজকুমার তীক্ষ্ণর সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছু নেই। খিদে পেলেও খেতে পারবে না কিছু। কোনও লোকের বাড়িতে আশ্রয় চাইলেই পেতে পারে। সেইরকমই প্রথা। ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অন্ন-পানীয় দিয়ে সবাই পুণ্য অর্জন করতে চায়। সেইজন্যই এইসব রাজ্যে কোনও লোক উপবাসী থাকে না। কিন্তু রাজার কুমার তীক্ষ্ণ কারও কাছে হাত পাততে জানে না।

সে রাজধানীতে এসে এক ধর্মশালার বারান্দায় শুয়ে রইল। তলোয়ারটা লুকিয়ে রাখল কাপড়ে মুড়ে। দু' দিন তার কোনও খাদ্য জোটেনি, শুধু জল খেয়ে পেট ভরাতে হয়।

আরও একজন ভিখিরির মতন চেহারার লোক ওই ধর্মশালার বারান্দায় থাকে। সে রাজকুমার তীক্ষ্ণর সঙ্গে ভাব জমাতে আসে, তার পরিচয় জানতে চায়। কিন্তু রাজকুমার তীক্ষ্ণ এমনিতেই কম কথা বলে, অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলতেই চায় না।

রাজকুমারের হাতে একটা আংটি আছে। সেই লোকটি ওই আংটিটির দিকে লোভীর মতন তাকায়। দ্বিতীয় রাতে ঘুমন্ত রাজকুমারের হাত থেকে সে ওই আংটিটা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল!

রাজকুমার জেগে উঠতেই সে কাঁচুমাচু হয়ে নিজেই বলে উঠল, "চুরি করতে চাইনি, চুরি করতে চাইনি, আমি শুধু ওটা একবার দেখতে চেয়েছি। তুমি ওটা বিক্রি করবে?"

আংটি যে বিক্রি করা যাবে, সেটাই জানত না রাজকুমার তীক্ষ্ণ। আংটিটার যে কত মূল্য, তাও সে জানে না। তিনরকম দুর্লভ পাথর বসানো অতি মূল্যবান সেই অঙ্গুরীয় সে বিক্রি করে দিল মাত্র দশটি মুদ্রার বিনিময়ে। পরদিন সেই টাকা দিয়ে সে খাদ্য ফল মূল কিনল।

আরও দু' দিন পরে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মল্লপালের। অনেক পথ ঘুরে ঘুরে সে তার দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়েছে যুধাখেরিতে।

বাহুকের দলবল রাজকুমার তীক্ষ্ণকে তাড়া করতেই মল্লপালরাও

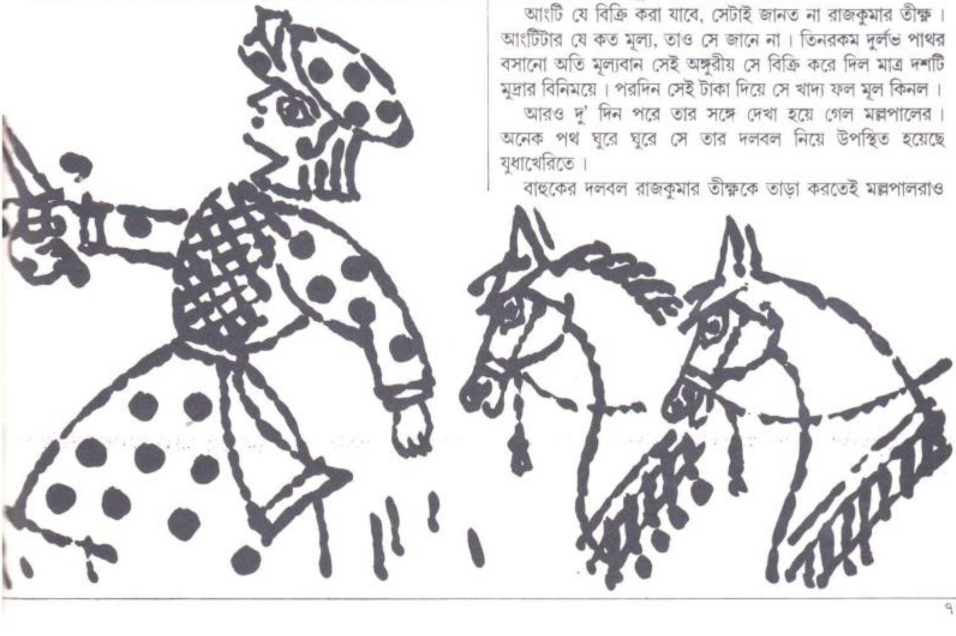

ভয়ে পালিয়েছিল। রাজধানীর বাইরে এক জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল দু' দিন। তারপর রাতের বেলায় হেঁটে-হেঁটে তারা সেই রাজ্য ছেড়ে আসে। পথে তারা শুনেছে, ভোজরাজা নাকি ঘোষণা করেছেন যে, রাজকুমার তীক্ষ্ণ ফিরে এলে তার সঙ্গেই তিনি দুই রাজকন্যার বিয়ে দেবেন। রাজকুমার তীক্ষ্ণ তার কালো ঘোড়ায় চেপেছে, দারুণ তরঙ্গমুখর নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। এর পরেও যদি সে বেঁচে থাকে তবে রাজকন্যারা তার গলাতেই বরমাল্য দেবে।

লুকা বলল, "রাজকুমার, চলুন, আমরা ভোজরাজ্যে ফিরে যাই। সেনাপতি মারা গেছে। রাজাও খুব বৃদ্ধ। রাজকন্যাদের বিয়ে করলে আপনিও সে রাজ্যের রাজা হবেন। আমরাও মহাসুখে থাকব!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "চুপ! ওই রাজকন্যারা যাকে ইচ্ছে বিয়ে করুক। আমি ওদের রাজ্যও চাই না। তোমরা শিবির স্থাপন কর।

তারপর খোঁজ নাও এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীর কে? আমি তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব!"

মল্লপাল হতাশভাবে বলল, "আবার যুদ্ধ? আবার আমাদের কী বিপদ হবে কে জানে?"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "আমি উত্তর ভারতের অন্তত তিরিশটি রাজ্য ঘুরতে চাই!"

গালবদেশের রাজা অসুস্থ। তাঁর রানি পল্লবী দেবীই রাজ্য চালান। সেনাপতি অতি বৃদ্ধ, এখন তিনি একটা বর্শাও তুলতে পারেন না, তবু তাঁকে সেনাপতি পদ থেকে ছাড়ানো হয়নি। তবে শহরের দুই কোটালই সৈন্যবাহিনীকে চালায়। কোটাল দু'জনের নাম দ্রব আর প্লব। সাধারণত সব রাজধানীতে একজন করেই কোটাল থাকে, এই রাজধানীতে দু'জন কোটাল। তার কারণ, দ্রব আর প্লব যমজ। তারা দেখতে হুবহু একরকম তো বটেই, তাদের চিন্তারও অদ্ভুত মিল। দ্রব যদি পুকুরঘাটে আছাড় খায়, তা হলে প্লব বিছানায় শুয়েও ব্যথায় উহু-হু করে ওঠে। দ্রব আর প্লব যতদূরেই থাকুক, একজনের খিদে পেলে অন্যজনও খিদেয় কাতরাবে। কিংবা প্লব যদি শুধু ডাবের জল খেয়ে পেট বোঝাই করে ফেলে, তখন দ্রব তার সামনে মণ্ডা-মেঠাই দেখলেও খাবে না।

কে যে দ্রব আর কে যে প্লব—তা প্রজারা চিনতেই পারে না। সবসময় ভুল করে। সেইজন্য পল্লবী দেবী ওদের দু'জনকেই কোটালের পদ দিয়েছেন।

দ্রব আর প্লব'র তলোয়ার খেলার খুব সুনাম। তারা গর্ব করে বলে যে একালে তাদের সমকক্ষ যোদ্ধা আর কেউ নেই। তাই তারা দু'জনেই মাঝে-মাঝে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মাতে। দু'জনেই সমান, কেউ জেতে না, কেউ হারে না।

লুকার মুখে সব খবর শুনে রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "যাও, ওদের দু'জনকেই আহ্বান জানাও। আমি একসঙ্গে ওদের দু'জনের সঙ্গেই লড়াই করব।"

লড়াইয়ের মাঠে হল এক অদ্ভুত কাণ্ড।

দ্রব আর প্লব দু'জনেই কালো কুচকুচে পোশাক পরে। দু'জনেই বেশ রোগা আর লম্বা। দু'জনেরই ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

দু' ভাই পাশাপাশি দাঁড়াল। ভাল করে দেখল রাজকুমার তীক্ষ্ণকে। তারপর দ্রব অস্ত্র হাতে না নিয়ে সোজা হেঁটে এসে এক থাপ্পড় কষাল রাজকুমার তীক্ষ্ণর গালে। দ্রব'র হাতে এত জোর যে সেই থাপ্পড় খেয়ে রাজকুমার তীক্ষ্ণ উলটে পড়ে গেল।

দু' ভাই একসঙ্গে হেসে উঠে বলল, "এই গায়ের জোর নিয়ে তুই লড়াই করবি? যা, বাড়ি যা!"

রাজকুমার তীক্ষ্ণর ঠোঁটের পাশ দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত গড়াচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে রক্ত মুছে সে দ্রবকে বলল, "তুমি আমাকে অন্যায়ভাবে আঘাত করেছ। আমার অস্ত্রের কোপে তোমারই প্রথম প্রাণ যাবে।"

তারপর সে তলোয়ার হাতে নিতেই দু' ভাই দু' দিক থেকে ধেয়ে এল তাকে আঘাত করতে। রাজকুমার তীক্ষ্ণ লাফিয়ে উঠে গেল তাদের মাথার ওপর। একসঙ্গে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর তলোয়ারকেই সে কী করে যে আটকাতে লাগল, তা বোঝাই গেল না।

দ্রব আর প্লব সত্যিই ভাল লড়াই জানে। তবু এই লড়াই চলল না বেশিক্ষণ। রাজকুমার তীক্ষ্ণ প্রথমে দ্রব'র ডান হাত কেটে ফেলল, তারপর তার বুকে তলোয়ার ঢুকিয়ে ধরাশায়ী করল। সঙ্গে-সঙ্গে প্লবও ধড়াম করে শুয়ে পড়ল মাটিতে। তার হাত থেকে খসে গেল তলোয়ার। সে আর কোনও শব্দ করল না।

রাজকুমার তীক্ষ্ণ নিরস্ত্রকে আঘাত করে না। প্লব'র কাছে গিয়ে বলল, "খুব যে হেসেছিলে? এর মধ্যেই লড়াইয়ের সাধ মিটে গেল? উঠে দাঁড়াও!"

প্লব কোনও উত্তর দিল না। উত্তর দিতে পারবেই না। দ্রব'র মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই তারও প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

এইভাবে রাজকুমার তীক্ষ্ণ একের পর এক রাজ্য ঘুরে-ঘুরে নামকরা বীরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করতে লাগল। বৈভব রাজ্য, ধরাশূর, উনকোটি, শ্রীপুর, মন্দারগড় রাজ্যে কোনও যোদ্ধাই রাজকুমার তীক্ষ্ণর সামনে আসতে সাহস করল না। চতুর্দিকে রটে গেছে যে এই রাজকুমার যেমন কৌশলী যোদ্ধা তেমনই নিষ্ঠুর। কোনও শত্রুকেই সে দয়া করে না। এই রাজকুমার যেন জাদুকর। লড়াইয়ের মধ্যে যখন-তখন অদৃশ্য হয়ে যায়, হঠাৎ-হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে ওঠে, গাছের ডাল ধরে ঝোলে। লোকের মুখে-মুখে রাজকুমার তীক্ষ্ণর আর-একটা নাম হয়ে গেল উড়ন্ত রাজকুমার।

সদলবলে রাজকুমার তীক্ষ্ণ এক সময় এসে পৌঁছল কাঞ্চী রাজ্যে। অহিছত্রপুর ছেড়ে আসার পর প্রায় দেড় বছর কেটে গেছে। কাঞ্চীতে এসেই তার জীবন আবার এক অন্যদিকে মোড় নিল। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

টাকাকড়ি

ভারতে টাকা তৈরির আদিম কারিগরি

ভারতের প্রাচীনতম দেশজ মুদ্রাগুলি কীভাবে তৈরি হত, জানিয়েছেন **ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

ভারতীয় উপমহাদেশে মুদ্রা বা টাকা প্রচলনের তারিখ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে কোনও এক সময় বলে অনুমান করা যেতে পারে। প্রাসঙ্গিক তথ্য আগেই জানানো হয়েছে। উত্তর-পশ্চিমের এক অংশে এই যুগে (অন্তত কিছুকাল যাবৎ) হখামনিশীয় (Achaemenid) সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং ওই অঞ্চলে মুদ্রা আবির্ভাবের পিছনে ওই পারসিক (Persian) সাম্রাজ্যের মুদ্রার প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু চেহারা ও ওজনরীতির হিসাবে ভারতের প্রাচীন ক্ষুদ্র ছাঁচে ছাপ মারা মুদ্রা (punch-marked coin) পারসিক স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা থেকে ভিন্ন। উপরন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের একাধিক অঞ্চলে এবং পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরেও প্রায় একই সময়ে মুদ্রার আবির্ভাবের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং পারস্য সাম্রাজ্যে প্রচলিত পারসিক মুদ্রা (বা বাণিজ্যের দ্রব্য বিক্রয়ের বিনিময়ে পাওয়া প্রাচীন গ্রিক মুদ্রা) সম্পর্কিত জ্ঞান ভারতীয়দের মুদ্রা ব্যবহারে খানিকটা উৎসাহিত করে থাকলেও, প্রাচীনতম ভারতীয় মুদ্রাগুলির অর্থাৎ ক্ষুদ্র ছাঁচে ছাপ মারা মুদ্রাগুলির ওজন, চেহারা ও প্রস্তুতপ্রণালী ছিল দেশজ।
অন্যান্য অনেক দেশের মতোই এই উপমহাদেশেও বোধ হয় বণিকরাই প্রথম মুদ্রার প্রবর্তন করেন। পরে আসে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব।

বুদ্ধগয়া ও ভারহুতে আবিষ্কৃত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের দুটি পাথরের ফলকে গোল, চৌকো, আয়ত ইত্যাদি আকারের মুদ্রার ছবি উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই মুদ্রার ওপরে গায়ে নানা জাতীয় প্রতীক, চিহ্ন ও জীবজন্তুর ছোট-ছোট ছবি দেখা গেলেও কোনও লেখ দেখা যায় না। সুতরাং মনে করা যেতে পারে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মধ্যে দেশজ প্রণালীতে টাকা তৈরির রীতি চালু হওয়ার পরে অনেকদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (বণিকসভা বা রাষ্ট্রের) পরিচয় দিত বিভিন্ন অভিজ্ঞানের ছোট-ছোট চিত্র। কর্তৃপক্ষের নাম লেখা থাকত না টাকার গায়ে। তাই মনে হয়, ভারতের প্রাচীনতম দেশজ মুদ্রাগুলি ছিল লেখবিহীন।
এইসব প্রাচীন লেখবিহীন মুদ্রা পাওয়া গেছে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও গুপ্ত ভাণ্ডার আবিষ্কারের ফলে, এ ছাড়াও চাষবাস, পুকুর ও বাড়ি তৈরির জন্য জমি খুঁড়তে গিয়ে বা জলে ধোওয়া নদীর ধার বা মাটির ঢিবিতে অনুসন্ধান করার দরুন। এই প্রাচীন মুদ্রাগুলি রুপো, তামা, এবং রুপো ও তামায় মেশানো বিলন নামের এক সংকর ধাতুতে তৈরি। প্রস্তুত প্রণালীর দিক থেকে এগুলিকে

বুদ্ধগয়া ও ভারহুতে আবিষ্কৃত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের দুটি পাথরের ফলকে গোল, চৌকো, আয়ত ইত্যাদি আকারের মুদ্রার ছবি উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই মুদ্রার ওপরে গায়ে নানা জাতীয় প্রতীক, চিহ্ন ও জীবজন্তুর ছোট-ছোট ছবি দেখা গেলেও কোনও লেখ দেখা যায় না।

কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।
বহুসংখ্যক রুপো এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক তামার খণ্ডের গায়ে এক বা একাধিক ছোট-ছোট চিত্র দেখা যায়। কিন্তু চিত্রগুলি খণ্ডের কোনও দিকই পুরোপুরি ভরিয়ে দেয় না। খণ্ডগুলির আকার চৌকো, আয়ত, গোল, উপবৃত্ত ইত্যাদি। এগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করলে তাদের প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়।
খুব মজার কথা, এই ধরনের মুদ্রা তৈরির কিছু খবর পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এক জালিয়াতের টাঁকশালে প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা থেকে (৪, ৪, ২০) এবং প্রাসঙ্গিক আরও কিছু আলোচনা থেকে (২, ১২, ২৪ ; ২, ১৩, ১ ইত্যাদি)। এইসব তথ্য থেকে মনে হয় ধাতুপিণ্ড (রুপো বা তামা) পরিশোধন করা হত আগুনের তাপে গলিয়ে ও তার সঙ্গে পরিশোধনকারী দ্রব্য যোগ করে। যেমন রুপো পরিশোধনের জন্য লাগত তার ওজনের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ সিসা। পরে গলানো পরিশুদ্ধ ধাতুর সঙ্গে যোগ করা হত উপযুক্ত পরিমাণে খাদ (যা টাকার প্রধান ধাতুকে শক্ত হতে সাহায্য করে)। খাদসমেত ধাতুকে আবার গলিয়ে এই গলিত ধাতু ছাঁচে ঢেলে পাত তৈরির রীতি ছিল। টাকার ধাতু যতটা পুরু হওয়া দরকার পাতকে ততটাই পুরু করা হত। পরবর্তী কাজ ছিল পাতটিকে কেটে নির্দিষ্ট ওজনের আন্দাজে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করা। এর পর খণ্ডগুলির ওজন পরীক্ষা করে অতিরিক্ত ওজনের খণ্ডের বাড়তি অংশ কেটে বাদ দেওয়া হত, আর খুব কম ওজনের খণ্ড বাতিল করে দিয়ে সেগুলিকে আবার গলিয়ে দেওয়া হত পরবর্তী পাতে ব্যবহারের জন্য। পরীক্ষিত খণ্ডগুলি ক্ষার দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়ার রীতি ছিল। এইভাবে তৈরি হত মুদ্রাযোগ্য ধাতবখণ্ড। (ক্রমশ)

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

বইয়ের খবর

সোনা তৈরি করতে

সাংবাদিক বিল গান যখন খুব ছোট, তাদের বাড়িতে সাঙ্ঘাতিক এক দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে যদিও কেউ মারা যায়নি, তবে তাদের বাড়ির একটা বড় অংশ স্রেফ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, বাকি অংশটার অবস্থাও হয়ে পড়ে প্রায় ধ্বংসস্তূপ। কোন সুদূর অতীত থেকে গোপনে-গোপনে নানা দেশে বৈজ্ঞানিকরা নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছেন রসায়নাগারে খাঁটি সোনা বানানোর জন্য। বিলের বাবা মিস্টার ফ্লয়েড আর তাঁর ডেন্টিস্ট বন্ধু জে·টি·আর্চার এমনই এক গোপন গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল ছোট্ট বিল। বড় হয়ে বিল সেই দিনগুলোর রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, উত্তেজনা, ভয়, আশঙ্কা, তার সেই বয়সে দেখা নানা দৃশ্য, বিভিন্ন চরিত্রের কার্যকলাপ—সবই লিখে রাখছে খাতায়।
বিল গান-এর জবানীতে লেখা এই বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাসটির নাম : 'দি অ্যালকেমিস্ট'। লেখক : মার্ক এলিস। প্রকাশক ব্লুমসবেরি প্রকাশনা সংস্থা। দাম ১৩·৯৫ পাউন্ড। সোনা তৈরি করা যে কত শক্ত, কত ঝুঁকি তাতে, আবার পাশাপাশি দমবন্ধ উত্তেজনায় ভরা প্রতিটি পদক্ষেপ, বইটি না পড়লে জানাই যাবে না। সব মিলিয়ে ভয়-ভয় রহস্যের একটা পরিবেশ গড়ে ওঠে। ভুলে যেতে হয়, ঘটনার স্থান ১৯৮৩ সালের লন্ডন শহর। কে জানে, হয়তো এখনও দেশে-বিদেশে সোনা তৈরি করার আশায়, গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন অনেকেই।

স্নিগ্ধ সুন্দর কাহিনী

ছোট ছোট দুটি ছেলে থাকে দূরের এক শহরে। দুই ভাই তারা। দু'জনে মিলে নানারকম দুষ্টুমি করে বেড়ায় সারাদিন। অন্যান্য সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে তাদের বনে না।

রিচার্ড্স ইগিলস্কির আঁকা ইলাস্ট্রেশন

শুধু ঝগড়া আর মারামারি হয়। দুই ভাই মিলে চুপিচুপি একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে, পৃথিবীর নানা দেশ দেখবে বলে উঠে পড়ল জাহাজে। কিন্তু, পথে হল জাহাজডুবি। জলে ভেসে, অনেক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে তারা পৌঁছল নিউ ইয়র্ক শহরে। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। সেই দুটি ছেলে এখন নিউ ইয়র্কের নামকরা দর্জি। ঘটনাচক্রে দু'জনে গেল ইংল্যান্ডের রাজসভায়। সেখানে গিয়ে আর-এক চমক, এত বছর বাদে দেখা হল বাবা-মা'র সঙ্গে।
স্নিগ্ধ-মধুর এই গল্পের বইটির নাম 'ও ব্রাদার'। লেখক আর্থার ইয়রিংকস। বইটিতে সুন্দর সব ছবি এঁকেছেন রিচার্ডস ইগিলস্কি। আর্থার ইয়রিংকস-এর আগের বইটি ছিল ইউ এফ ও বা রহস্যময় উড়ন্ত আকাশযান নিয়ে রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেঞ্চার। নাম : কম্পানিস কামিং। বইটি মুগ্ধ করেছিল পাঠকদের। ও ব্রাদার বইটিও যথেষ্ট জনপ্রিয় হবে বলে মনে করছেন লেখক। এই বইটির প্রকাশক ফ্রারার স্ট্রস জিরাক্স সংস্থা। দাম : ১৫·৯৫ ডলার।

জোয়ানের কাহিনী

জোয়ানের জীবনে হাজার ঝামেলা পাকিয়ে উঠেছে। যদিও তার বয়স মাত্র বারো বছর। প্রথমত সে একটু মোটাসোটা, তাই পাড়ার বন্ধুরা তাকে খেপায়। এদিকে বাড়িতেও নানা অশান্তি, বাবা-মা সবসময় ঝগড়া করেন, সে ব্যাপারটা একটুও ভাল লাগে না তার। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা জোয়ান পুরনো স্কুল ছেড়ে নতুন স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর দেখা দিয়েছে। নতুন স্কুলে কিছুতেই তার মন বসছে না। তার কারণও আছে। আগের স্কুলে জোয়ান ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় ছাত্রী। শিক্ষিকারাও তাকে পছন্দ করতেন খুব।
পরের ঘটনাটা আরও দুঃখের। জোয়ানদের ক্লাস থেকে যে নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে, তাতে জোয়ানকে মুখ্য ভূমিকা দেওয়া দূরে থাক, স্রেফ বাদ রাখা হয়েছে। শেষে অনেক বলে-কয়ে সে পেয়েছে একটা ইঁদুরের খুব ছোট চরিত্র। অন্যদিকে ঝগড়ুটে ক্যাথি, বোকা রায়ান, পাজি শিমার, এমনকী হিংসুটে মেভ্‌লিন পর্যন্ত হয় মুখ্য চরিত্র, নয় মোটামুটি বড়সড় ভূমিকায় অভিনয় করছে।
এই সমস্ত সমস্যাকে কী করে সমাধান করল জোয়ান, জিতে নিল সকলের ভালবাসা, কখন যেন ম্যাজিকের মতো ঘটল দারুণ-দারুণ ঘটনা—সেইসব নিয়েই লেখা জ্যাকুলিন উইলসনের 'দি লেফট আউটস'। প্রকাশক ব্ল্যাকি সংস্থা। দাম ৬·৯৫ পাউন্ড। জোয়ানের কাহিনী একবার পড়তে শুরু করলে ছাড়া মুশকিল।

অভীক মজুমদার

গল্প এবং রূপকথা

সিংহবাহিনী রহস্য
বাণীব্রত চক্রবর্তী
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৯
দাম : বারো টাকা।

যেমন বড়দের জন্য লেখালিখিতে তেমনই কিশোরপাঠ্য রচনাতেও বাণীব্রত চক্রবর্তীর কলমের জাদু চোখে পড়বার মতো। আলোচ্য বইটি দুটি টানটান রহস্যকাহিনী এবং একটি অভিনব কৌতূহলকর গল্পের সংকলন। পড়া শুরু করলে এ-বই শেষ না করে উপায় নেই। সুব্রত চৌধুরীর প্রচ্ছদ সুন্দর।

কিশোর রূপকথা
হেমন্তবালা দেবী চৌধুরাণী
দে বুক স্টোর
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
দাম : পঁচিশ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে রূপকথার কদর আজও কিছু কম নয়। সমবয়সী পাঠকের কাছেই এর আবেদন।

হেমন্তবালা দেবী-র আলোচ্য বইটি এগারোটি চমৎকার রূপকথার অনুপম একটি সঙ্কলন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁকে লিখেছিলেন '...তোমার লেখা কিছু কিছু আমার চুরি করতে ইচ্ছা করে। ...ভাবনার ভঙ্গীর সঙ্গে ভাষার ভঙ্গী লীলায়িত হয়ে চলেছে। এরকম লেখা সহজ নয়।...' এই অভিমত যে কতখানি সত্য তা বইটি পড়লেই বোঝা যায়।

প্রমোদ বসু

ধাঁধা

গতকাল ছিল ছুটির দিন। মে দিবসের ছুটি। কিন্তু আমাদের সেজদাদুর খুব ভোগান্তি গেল এই ছুটির দিনে। দুপুরে খেতে বসে সেজদাদু আক্ষেপ করে বললেন, "ছুটি তো নয়, আজ শুধু-শুধু আমার ছোটাছুটি।"
কথাটা মজা করে বলা। কিন্তু উপভোগ করলেও আমরা হাসতে পারিনি। পারিনি, সেজদাদুর কষ্টের কথা ভেবে। সত্যি তো, এই বয়সে কাকভোরে উঠে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন সেজদাদু। ভোরবেলার ট্রেন ধরবেন হাওড়া থেকে। কিন্তু আগে-থেকে কাটা টিকিট বৃথা গেল। সেজদাদু পৌঁছবার আগেই ট্রেন ছেড়ে গেছে। দূরপাল্লার ট্রেন। এই টিকিটে আর যাওয়ার উপায়

নেই। শিলিগুড়িতে পৌঁছতে পারলেন না সেজদাদু। বাড়ি ফিরে এলেন।
অথচ, রাস্তাঘাটে যে খুব জ্যাম ছিল, তা নয়। আসলে ঘুম থেকে উঠতেই অল্প দেরি হয়ে গিয়েছিল সেজদাদুর। ঘড়িতে অ্যালার্ম দেবেন বলে কাঁটা

ঘুরিয়েছিলেন, কিন্তু দম দিতে ভুলে গেছেন। তাই অ্যালার্ম বাজেনি।
সেদিনই বিকেলবেলা ছোট্‌কা আমায় বলল, "জানো সতুবাবু, আমি একজনের কথা জানি, যে কিনা কাঁটাও ঘুরিয়েছিল, দমও দিয়েছিল, তবু চিরকালের জন্য তার নাম উঠল ধাঁধার খাতায়।"
কথাটা ঘুরিয়ে বলা। আর তাই আমি চুপ করে অপেক্ষায় থাকলাম। ছোট্‌কা নিশ্চিত একটা ধাঁধা দেবে এবার।
যা ভেবেছি তাই। ছোট্‌কা একটা মজার ধাঁধাই শোনাল। শুনবে?

প্রথম ধাঁধা ॥ একজন ঘুমকাতুরে লোক। শীতকালের সকালে বেলা দশটার আগে তার ঘুমই ভাঙে না। কিন্তু একদিন বিশেষ কাজে তাকে সকাল ন'টাতে উঠতে হবে। উঠতেই হবে। লোকটি করল কী, অ্যালার্ম-ঘড়িটায় ঠিক ন'টার ঘরে কাঁটা ঘুরিয়ে এনে ভাল করে দম দিয়ে রাখল আগের দিন সন্ধেবেলা। তারপর তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে ঠিক আটটার সময় শুয়ে পড়ল। ঘুমও এসে গেল পলকে।
এখন বলো, অ্যালার্ম শুনে যদি তার ঘুম ভেঙে থাকে, তা হলে মোট ক' ঘণ্টা ঘুমিয়েছে লোকটি?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কাকে দু'বার ডাকলে তার ভাই এসে হাজির হবেন?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—
বামরাগভ্যাঙ্গা

গতবারের উত্তর ॥ ১। (ক) ১, ৮, ১১, ১৪ (খ) ২, ৫, ১২, ১৫ (গ) ৩, ৬, ৯, ১৬ এবং (ঘ) ৪, ৭, ১০, ১৩ নম্বরি-খাম পাবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে পাবে ৩৪ হাজার করে। (২) তামরস। (৩)- দুরতিক্রমণ।

সত্যসন্ধ

কত কথা

'বলো দেখি ঝাঁজ কেন যোয়ানের আরকে'—সুকুমার রায়ের বিখ্যাত কবিতার একটি লাইন। 'আরক' মানে নিশ্চয়ই জানো—নির্যাস। সেটা অবশ্য প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে এই আরক শব্দের অক্ষর উলটে-পালটে দ্যাখো তো অন্য কোন্ শব্দ পাও? তা ছাড়াও আরও দুটি শব্দ দেওয়া হল—'জমানা', 'পলাশ'। এ-দুটি শব্দেরও অক্ষর উলটে-পালটে অন্য শব্দ বানাও।

২। 'কুম্ভকর্ণ' শব্দটির মধ্যে পর-পর মোট ক'টি এবং কী-কী শব্দ পাওয়া যেতে পারে?

৩। এমন একটা ফলের নাম করো তো যে-নামের ফুলও আছে?

উত্তর: ১। আকর, নামাজ, পশলা। ২। কু, কুম্ভ, কুম্ভক, কর্ণ—মোট ৪টি শব্দ। ৩। বেল।

কথক

মজার খেলা

তিনটে ছোট-বড়-মাঝারি পেনসিল যদি জোগাড় করতে বলি, সেটা কি খুব শক্ত কাজ হবে?
তা কেন হবে! পেনসিলবাক্স ঘাঁটলেই তিন মাপের তিনটে পেনসিল ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। আর এ-তিনটে পেনসিল হাতে এলেই আমরা দেখাতে পারব দারুণ মজার একটা খেলা।
পেনসিল তিনটেকে টেবিলের উপর নীচের ছবির মতো সাজিয়ে ফ্যালো। সাজানো বলতে, একটা কথাই মনে রাখার। তা হল, সবথেকে বড় মাপের পেনসিলটা যেন ঠিক মাঝখানে থাকে। ছোট আর মাঝারি পেনসিল দুটো থাকবে বড় পেনসিলের যে-কোনও দু'পাশে। ছবি দেখে পেনসিল সাজানোর ব্যাপারটা বুঝে

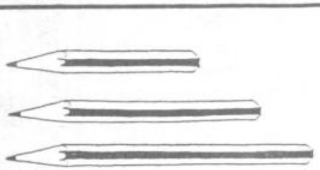

গেছ নিশ্চিত। বেশ। এবার মন দিয়ে শোনো, কী করতে হবে।
করতে হবে কী, সব থেকে বড় মাপের পেনসিলটাকে মাঝখান থেকে সরাতে হবে। কিন্তু শর্ত হল, বড় মাপের পেনসিলটাকে ছোঁয়া চলবে না। হাত দিয়ে ছুঁতে পারবে না, অথচ বড় মাপের পেনসিলটাকে মধ্যিখান থেকে সরাতে হবে, এ কী করে হয়? এই তো ভাবছ তোমরা? ভাবো, ভাবো, আবার ভাবো। কিন্তু, একটা কথা মনে রেখো, ব্যাপারটা মোটেও অসম্ভব বা অবাস্তব কিছু নয়। কীভাবে হয়? কেন, মধ্যখানের পেনসিলটাকে না ছুঁয়ে যে-কোনও একপাশের একটা পেনসিলকে যদি তুলে এনে অন্যপাশে বসিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে? তা হলে তো আর সব থেকে বড় পেনসিলটা মাঝখানে থাকছে না তখন। হাত দিয়ে না ছুঁয়েও বড় পেনসিলটার অবস্থান পালটে দেওয়া যাচ্ছে। এই তো, ছবিতেই দ্যাখো না। দেখলে মজাটা?

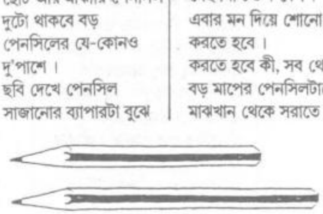

মজারু

পরিবারের প্রাণস্পন্দন
ঠাকরমার যত আনন্দ নাতনীর আহ্লাদে। ওদের আনন্দে রাখুন। সুস্বাস্থ্যের জন্য হরলিক্স দিন। আপনার পরিবারের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি আছে এতে।
স্বাস্থ্য ঝলমল,
প্রাণচঞ্চল,
গুণেভরা হরলিক্স।
পরিবারের প্রাণস্পন্দন।
প্রোটিন
ভিটামিন
মিনেরাল
কার্বোহাইড্রেট
ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ
সহজ পাচ্য
শক্তির উৎস
সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক
Horlicks
WITH EXTRA CALCIUM
The Great Nouriser
মহান পুষ্টিদাতা

ANANDAMELA 2 MAY 1990 REGD.NO.
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN/MS(C) 731